ডিপফ্রিজ

চিরঞ্জীব সেন

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৯৬১

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন :
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীশীতলচন্দ্র রায়
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট :
শ্রীমনোজ বিশ্বাস

বারো টাকা

ডিপফ্রিজ

হিমতভাই শাহ্ আত্মহত্যাই করেছিল, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমার কাছে প্রমাণ আছে অথচ সে প্রমাণ আমি পেশ করবার সুযোগই পেলুম না। নাকি সুযোগ পেলেও আমি অব্যাহতি পেতুম? অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে আমার নিজেরই এক সময় সন্দেহ হল হিমতভাইকে কি আমিই খুন করেছি?

হিমতভাই শাহর আসল বাড়ি সুরতে। আমরা যাকে বলি সুরাট গুজরাটবাসীরা তাকেই বলেন সুরত। এই সুরাটেই ইংরেজরা প্রথম কুঠি স্থাপন করেছিল। বর্তমানে সুরাট বিখ্যাত জরি-কাজ ও হীরক ব্যবসায়ের জন্যে বিখ্যাত। সুরাটে যারা হীরে কাটে তারা অধিকাংশই বাঙালী। কবে তারা বঙ্গদেশ থেকে এদেশে এসেছিল তা তারা বলতে পারে না। তারা গুজরের সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

সুরাট একটি মুখরোচক খাদ্যের জন্যও বিখ্যাত। সে খাদ্যের নাম নানখাটাই। স্থানীয় লোকের কাছে বাতাসা ও বিস্কুট নামেও পরিচিত, তবে স্বাদের পার্থক্য আছে। এই নানখাটাই আবিষ্কারের কৃতিত্ব কিন্তু পার্শীদের।

হিমতভাইয়ের পূর্বপুরুষরা প্রধানতঃ জরি ও হীরের ব্যবসা করে অর্থসঞ্চয় করেছিলেন। হিমতভাইয়ের ঠাকুদা তুলো ও চীনা বাদামের ব্যবসা করে সুরাট বণিকমহলে ধনী বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।

হিমতভাই পরিবার থেকে বেরিয়ে এসে লিমিটেড কোম্পানি স্থাপন করে তারা শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন। গুজরাটে পেট্রল আবিষ্কৃত হওয়ার পরে হিমতভাই নানারকম ভারী শিল্পের সম্ভাবনা দেখতে পান।

ভারুচ বা ব্রোচ নামে পরিচিত ছিল এবং যে শহরটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের বরিচ সেই শহরে এবং বরোদার আশেপাশে হিমতভাইয়ের দক্ষ পরিচালনায় কয়েকটি বড় ও আধুনিক কারখানা গড়ে উঠল। কারখানায় প্রস্তুত মাল পূর্ব আফ্রিকা, আরব দেশসমূহ ও ইরানে প্রচুর

পরিমাণে সরবরাহ হতে লাগল, দেশেও প্রচুর চাহিদা। দেশেবিদেশে কোম্পানির নাম ছড়িয়ে পড়ল।

নর্মদা ভ্যালি ইণ্ডাস্ট্রির হেড অফিস বরোদা শহরে স্থাপিত হলেও কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিমতভাই শাহ বরোদায় থাকতেন না। তিনি থাকতেন শহর থেকে কিছু দূরে ছানি নামে পল্লীতে। তাঁর দীর্ঘদিনের ইচ্ছে বেশ বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা একটা বাগান বাড়িতে তিনি থাকবেন।

সেইভাবেই তিনি মনের মতো সাজিয়ে আধুনিক এই বাড়িখানা তৈরি করেছিলেন। বরোদা-আমেদাবাদ রোডের ওপর বাড়িখানা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। বাড়িখানার তিনি নাম দিয়েছিলেন গ্রীণ পার্ক। চারদিকে প্রচুর গাছপালা, ভেতরে লন, ফ্লাওয়ার বেড, স্ট্যাচু, ফোয়ারা। তিনখানা মোটর গাড়ি, একটা রোলসরয়েস, একটা ক্যাডিলাক এবং একটা বিউইক। একটা স্টুডিবেকার ছিল কিন্তু সেটা তিনি কোম্পানিকে দান করে দিয়েছেন।

বি. এ পাশ করার পর চাকরি যোগাড় করতে না পেরে অনেক রকম কাজ শিখলুম যেমন টাইপরাইটিং, রেডিও মেকানিক, ড্রাইভিং, রেফ্রিজারেটর মেকানিক কিন্তু কিছুতেই একটা চাকরি যোগাড় করতে পারলুম না। ব্যবসা আমাদের বংশে নেই, আমাদের মাথাতেও নেই এবং ক্ষুদ্র একটা ব্যবসা করতে গেলে যেটুকু মূলধনের প্রয়োজন তাও আমার নেই।

শুনেছিলুম গুজরাটে গেলে চাকরি পাওয়া যায়, তাই ঘুরতে ঘুরতে গুজরাটে এসে হাজির হয়েছিলুম এবং কুক্ষণে। প্রথমে উঠেছিলুম বরোদা শহরে এক লজিং হাউসে। বরোদায় এসে শুনলুম ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শহরে নামও বদলে গেছে, বর্তমান নাম ভদোদরা তবে স্থানীয় ব্যক্তিরা এখনও বরোডা বলেন।

শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু করে অনেক খ্যাতনামা বাঙালী এই শহরের একদা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাই বোধহয় আমি এই শহরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলুম।

বরোদায় এসে ভাষা নিয়ে কিছু অসুবিধেয় পড়েছিলুম। সর্বত্রই গুজরাটী ভাষার প্রভাব এবং রেলস্টেশনের মতো অমন জমজমাট বাস-

স্ট্যাণ্ডে ও বাসের বোর্ডে বা সময়সূচীতে কোথাও একটি ইংরেজি অক্ষর নেই। যাইহোক আমি গুজরাটে আসবার আগে হাওড়া স্টেশনে হুইলারের স্টলে একখানা গুজরাটী সেলফ-টট বই কিনে মোটামুটি পড়তে শিখে গিয়েছিলুম। তবে শহরে হিন্দি ভাষা চলে তাই অসুবিধে হচ্ছিল না।

চাকরির ক্ষেত্রে দেখি চাকরি পাওয়া দুরূহ। যেসব চাকরি পাওয়া যাচ্ছিল সেগুলি আমার মনঃপুত নয় বা বেতন কম। কি করব ভাবছি, বম্বে যাব নাকি? নাকি এখানকার কলকারখানাগুলোয় আর একবার চেষ্টা করে দেখব? আপাততঃ একটা টাইপিস্ট এমন কি বড় সাহেবের ড্রাইভারের চাকরি পেলেও চলবে।

সেদিন পদ্মাবতী মার্কেটে ইউনাইটেড নিউজ এজেন্সির অফিস থেকে বেরিয়ে হঠাৎ জয়ন্তীভাইয়ের সঙ্গে দেখা। সে ঐ অফিসে যাচ্ছিল। জয়ন্তীভাই অনেক দিন কলকাতায় ছিল, একটা বড় অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে চাকরি করত। সে আমার কলেজের বন্ধু, ভাল বাংলা বলে, ওর সঙ্গে আমার মেলামেশা ছিল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ও গুজরাটে চলে আসে। প্রথমে কয়েকখানা চিঠি বিনিময় হয়েছিল কিন্তু পরে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শুনেছিলুম সে আমেদাবাদে আছে এবং একটা কোনো ব্যবসা করবার চেষ্টায় আছে, তাই হঠাৎ বরোদায় তাকে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলুম।

কি রে অসিত তুই এখানে?

যা ভিড়, এখানে দাঁড়িয়ে তোকে সব কথা বলা যাবে না, আয় এই মিষ্টির দোকানে বসা যাক।

জয়ন্তীভাইকে আমরা জয়ন্ত বলে ডাকতুম। তাকে সব কথা বলে বললুম, ইউনাইটেড নিউজ অফিসে কয়েকজন বাঙালী আছে, ওদের কাছে মাঝে মাঝে চাকরির খোঁজ নিতে আসি।

জয়ন্তীভাই বলল, আমিও একটা কাজে ঐ অফিসে যাচ্ছিলুম, যাকগে কি বললি? চাকরি খুঁজছিস? তিন চারশ টাকা মাইনের একটা চাকরি তোকে আমি এখনি পাইয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে কি তোর পেট ভরবে? তার চেয়ে তুই আমার সঙ্গে কাজ কর, চেহারা ভাল আছে, ইংরেজিটাও ভাল বলিস।

তুই কি করছিস ?

আমি এখানে একটা অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি খুলেছি কিন্তু একা সবদিক সামলাতে পারছি না। তোকে আমি সব শিখিয়ে দেবো। এই সহরে বেশ কিছু বড় ব্যবসায়ী আছে কিন্তু তারা বিজ্ঞাপন করতে চায় না, তাদের বধ করতে হবে। এরকম দু চারটে ক্লায়েন্ট যদি পাই তাহলে আমার এবং তোরও বরাত ফিরে যাবে। তুই কাল আমার অফিসে আয়, সুরসাগরের সামনেই আমার অফিস। আপাততঃ তোর থাকা খাওয়ার খরচের ব্যবস্থা আমি করে দেবো। ও আমাকে একটা কার্ড দিল। পরদিন ওর অফিসে গেলুম। ছোট অফিস। অফিসে একটি মাত্র মেয়ে আছে, ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট এবং একজন পিওন।

জয়ন্ত বলল, ছোট ঘর ও মাত্র দু'জন স্টাফ দেখে ঘাবড়ে যাস না। আমি আমার সব কাজ বাইরে থেকে করিয়ে নিই, মিছেমিছি স্টাফ পোশবার জন্যে খরচ করতে হয় না। সময় নষ্ট করে লাভ নেই, আয় তোকে একটা লেকচার দিই, আজই তোকে একটা বড় বেকারিতে পাঠাব। এই লোকটিকে আমি কায়দা করতে পারছি না।

জয়ন্তর কাছ থেকে কিছু ট্রেনিং নিয়ে সেদিনই বিকেলে আমি গুজরাট বেকারির মালিকের সঙ্গে সরাসরি দেখা করলুম। মালিক বললেন, আমাদের বিজ্ঞাপন দেবার কোনো দরকার নেই কারণ আমাদের যা মাল তৈরি হয় তা সবই বিক্রি হয়ে যায়, বরঞ্চ আরও চাহিদা আছে।

সে কি স্যার, বিজ্ঞাপন করবেন না কি ? পয়সা দিয়ে যারা আপনার রুটি কিনে খাচ্ছে তাদের জানান দরকার যে তারা উৎকৃষ্ট রুটি খাচ্ছে। এইভাবে বিজ্ঞাপন করে আপনি আরও চাহিদা বাড়ান, কারখানা বড় করুন, নইলে দেখবেন কবে আর একজন বেকারি খুলে, বিজ্ঞাপন করে, বাজার মাৎ করে দিল। তখন আপনি থাকবেন কোথায় ?

ঐ কথাতেই কাজ হয়েছিল এবং মালিক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম বিজ্ঞাপন করতে রাজি হয়ে গেলেন। সেই থেকে জয়ন্তর সঙ্গে লেগে রইলুম কিন্তু তখনও পর্যন্ত ঐ গুজরাট বেকারির তুল্য বড় ক্লায়েন্ট পাই নি।

সেদিন রাত্রে একজন মক্কেল পাকড়াবার উদ্দেশ্যে বরোদার একটি

ক্লাবে গিয়েছিলুম। মক্কেলের সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। এখন বাসায় ফেরবার জন্যে ক্লাবের সামনেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একটা অটো-রিকশ্ ধরবার মতলবে ছিলুম। রীতিমতো ধনী ছাড়া এই অভিজাত ক্লাবের কেউ সভ্য হতে পারে না, তবে কিছু বড় বড় অফিসারও এই ক্লাবের সভ্য আছেন।

এমন সময় দেখি ক্লাবের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন একজন ভদ্রলোক, তিন চারটে ধাপ, তারপর ফুটপাথ, তারপর রাস্তা। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ বছরের এদিকে বা ওদিকে, পরণে বেশ দামী স্যুট, পায়ে চকচকে দামী জুতো। তাঁর চলার ভঙ্গি দেখেই বুঝেছিলুম তিনি প্রচুর মদ্যপান করেছেন, পা টলছে।

ট্রাফিক পুলিস হয়তো হাত বাড়িয়ে ছিল, অনেকগুলি গাড়ি আটকে ছিল, পুলিস হাত নামিয়েছে, পর পর অনেকগুলি গাড়ি বেশ জোরে আসছে। তাদের মধ্যে একটা ডবল ডেকার বাস প্রায় ফুটপাথ ঘেঁসে জোরে চলেছে।

ভদ্রলোকের হুঁস নেই, তিনি তো তখন অন্য জগতে বিচরণ করছেন। ফুটপাথে সোজা গিয়ে প্রায় রাস্তায় নেমে পড়েছেন। আর মাত্র আধ সেকেণ্ড, ভদ্রলোক নির্ঘাৎ ডবল ডেকারের বিরাট চাকার তলায় পড়বেন। আমি ভদ্রলোককে ধরে ফেললুম, বাসখানা হুস্ করে বেরিয়ে গেল।

মাতাল হলেও ভদ্রলোকের তখনও কিছু জ্ঞান ছিল। আমি তাঁকে ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বোধহয় চমক লেগেছিল এবং কি বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল বুঝতে পেরে তিনি আমাকে পালটা জড়িয়ে ধরে বললেন, খুব বাঁচিয়েছ তো আমাকে। কাল না পরশু কালো ঘোড়া চক্করে এক ইস্কুলের দিদিমণি সাইকেল চড়ে যাচ্ছিল, ডবল ডেকারের নিচে পড়ে মরে গেছে না? তবে আমি যদি এখনি মরে যেতুম, তাহলে একজন খুশি হ'ত।

কি সব বাজে বকছেন, চলুন আপনাকে আপনার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

হ্যাঁ, আমার একখানা রোলস আছে বটে কিন্তু কোথায় রাখলুম মনে করতে পারছি না। তবে এখানে কেন, সারা বরোদায় এখন মাত্র দুটি রোলস আছে, একটি ফতে সিং গাইকোয়াড়ের আর অপরটি আমার।

আমি দেখলুম ক্লাবের পাশেই ফাঁকা জমিতে পনেরো ষোলোখানা গাড়ি পার্ক করা হয়েছে। সব কটা অ্যামবাসাডর, মার্সিডিস বা প্রিমিয়ার পদ্মিনী। কিন্তু রোলসরয়েস রয়েছে মাত্র একখানাই, ক্রিম আর ব্লু রঙের।

আমি তাঁকে ধরে ধরে তাঁর গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার ড্রাইভার কই?

আমার ড্রাইভার নেই।

মনে মনে ভাবছি বোধহয় সঙ্গে ড্রাইভার আনেন নি কিন্তু এলোক তো এখন যে অবস্থায় আছে তাতে এর পক্ষে এখন গাড়ি চালানো অসম্ভব, এখনই অ্যাকসিডেন্ট করবে, আমিই কি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবো? রোলসচালাবার আমার অনেক দিনের বাসনা। আজকাল আর রোলস গাড়ি তৈরি হচ্ছে না, এই একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার মনের কথা বোধহয় ভদ্রলোক শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন, বাওয়া আমার প্রাণটা ত বাঁচালে কিন্তু এখনও বাঁচে নি, অবস্থা ত বুঝতে পারছ, এখন গাড়ি চালালে আবার অ্যাকসিডেন্ট, তা তুমি গাড়ি চালাতে পার? আমার রোলস অবিশ্যি জলের মতো চলে, কোনো ভয় নেই, নাও উঠে পড়, আমি তোমার পাশে বসছি।

গাড়িতে ওঠবার পর বললেন, সোজাই চল, আমি থাকি ছানিতে, আমার বাড়িখানার নাম গ্রীন পার্ক, চিনতে অসুবিধে হবে না, আমার বাড়িতে চল, একটু ড্রিংক করবে ··।

তারপর ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম তিনি সিটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে ধ্যানস্থ। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

কই? স্টার্ট দাও। স্টার্ট দিলে আমার গাড়ি নিজেই চলবে।

আমি চমকে উঠেছিলুম। যাইহোক তাঁর কথাই ঠিক। স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলুম। অনেক পুরনো গাড়ি কিন্তু এখনও কি সুন্দর চলে, সত্যিই জলের মতোই চলছে।

সয়াজী বাগের পাশ কাটিয়ে বরোদা রেল স্টেশনের সামনে দিয়ে এসে মেন রোড ধরে ছানির দিকে চললুম। বাসে যাবার পথে ছানি চিনেছিলুম।

এখান থেকে চার পাঁচ মাইল হবে বোধহয়। আমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হল। রোলসরয়েস চালাচ্ছি।

ভদ্রলোক আবার ধ্যানস্থ হলেন। নর্বাক। আমি ভাবছি ভদ্রলোক বুঝি এ'র সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে ছানি এসে গেল। আবার চমকে উঠলুম। ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন।

ঐ দেখ বঁা দিকে, গেটের মাথায় সবুজ আলো জ্বলছে, সোজা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো।

আমি গাড়ির গতি কমিয়ে গেটের ভেতর ঢুকে খুব আস্তে যাচ্ছি। তিনি বললেন, আর একটু এগিয়ে চল, গাড়িটা গ্যারাজ করে দিই, তারপর তুমি আমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে যাবে।

গাড়ি গ্যারাজ করে দুজনে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে চললুম। ভেবেছিলুম সাযেবের গাড়ি ঢুকতেই বুঝি দারোয়ান, আরদালি, বেয়ারার দল ছুটে আসবে, কিন্তু কেউ এলনা। বাড়িতে যে আর লোক আছে বলে মনে হল না।

কি ব্যাপার? এত বড় বাড়ি, ভদ্রলোক ত রীতিমতো ধনী বলেই মনে হচ্ছে, অথচ বাড়ি অন্ধকার, লোকজনের দেখা নেই! যাইহোক তাঁকে অনুসরণ করে বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম। তিনিই সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। নিজেই দরজা বন্ধ করে বললেন, চল ওপরে আমার ঘরে যাই, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

এত রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ? আমি মনে মনে শংকিত হই। ভদ্রলোকের নামটাও এখন জানা হল না। কারপেট মোড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তিনি বললেন তোমার নামটা কি বললে না ত?

আমার নাম অসিত চৌধুরী।

না, আমি তোমার নাম শুনি নি, আমার নাম হিমতভাই শা।

হিমতভাই শা? আরে এই নামটাই ত জয়ন্ত আজ সকালেই বলছিল। এদের বিরাট ইণ্ডাস্ট্রী, বিজ্ঞাপনের জন্যেওবিরাট বাজেট, বছরে বোধহয়, দশ পনেরো লাখ। ইস্ এমন যদি একটা ক্লায়েণ্ট পাওয়া যেত, তাহলে নিজেই একটা অ্যাডভারটাইজিং খুলে বসতুম কিন্তু ওদের সমস্ত বিজ্ঞাপন পরিচালনা করে আমেদাবাদের শিল্পী অ্যাডভারটাইজিং।

তুমি কি আমার নাম শুনেছ? আমাদের কয়েকটা কারখানা আছে, মেসিন তৈরি হয়, এছাড়া প্রেসার কুকার আর সাবানেরও একটা কারখানা আছে।

আমি বলি হ্যাঁ, আপনার নাম শুনেছি।

শুনেছ? আমি কিন্তু ফিল্মস্টার নই, যাইহোক আমার স্ত্রীকে ডেকে বলি এই সুদর্শন ছোকরাটি না থাকলে তুমি এতক্ষণে বিধবা হতে। তারপর দেখনা কি মজাটাই না হয়।

ধনীর বাড়িতে রাতে মজা দেখার আমার ইচ্ছে ছিল না। তবুও যখন একজন ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তখন দেখাই যাক না ওঁকে ধরে কিছু করতে পারি কি না। কিন্তু আমি বোধহয় হিমতভাই শাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেই ভাল করতুম।

দেওয়ালে ডিজিটাল ক্লক ছিল, দেখে বললেন, আমার স্ত্রী বোধহয় শুয়ে পড়েছে। তবে শুয়ে পড়লেও ঘুমিয়ে পড়েনি, বই পড়ছে, নভেল পড়তে খুব ভালবাসে, তুমি আরাম করে ঐ চেয়ারটায় বোসো।

বেশ বড় সাজানো ঘর। মেঝের কারপেট, আসবাব পত্র, পর্দা, দেওয়ালের ছবি, সবকিছু দামী। কিন্তু সারা ঘরখানায় পরিচ্ছন্নতার অভাব। অ্যাসট্রে উপচে ছাই পড়ছে, মেঝেতে কয়েক টুকরো কাগজ, টিপয়ের ওপর খালি কাপ ডিস। বাড়িতে কি কোনো ভৃত্য বা কাজের লোক নেই?

কি ড্রিংক করবে? আমার কাছে সব আছে। জানত গুজরাটে সুরা নিষিদ্ধ, তবে আমার পার্সোনাল পারমিট আছে। গুজরাটে প্রচুর বিলিতি মদ পাওয়া যায়। এসব আসে আরবশাহী দেশ থেকে নৌকো করে। তা তুমি কি খাবে বল?

একটু আধটু পান করা অভ্যাস থাকলেও এতবড় একজন লোকের সামনে ড্রিংক করব কি? তাই বললুম, আমি ড্রিংক করি না।

তা কি হয়? তুমি আমার বন্ধু, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, আচ্ছা ঠিক আছে, একটা লেমনেডের সঙ্গে জিন মিশিয়ে দিচ্ছি, খাও, ভাল লাগবে, ক্ষিধে হবে, সুনিদ্রা হবে। তুমি কি কর?

বিজ্ঞাপনের কাজ করি।

বিজ্ঞাপন? বাঃ বেশ ত, ভারি মজার কাজ। তা কেমন রোজগার হয়?

আমি বলি এমন বিশেষ কিছু নয়, চলে যায়।

তার মানে তুমি এই লাইনে সুবিধে করতে পারছ না। তা তোমার পোশাক দেখে বুঝতে পারছি।

ভদ্রলোক আলমারি খুলে একটা শিশি বার করলেন, তারপর আর একটা শিশি থেকে একটা ট্যাবলেট নিলেন। ঔষধ খাবার, একটা গেলাসে প্রথমে সেই ট্যাবলেটটা দিলেন, একটু জল দিয়ে নাড়তে ট্যাবলেটটা গলে গেল, তারপর সেই শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ মিশিয়ে সেটুকু খেয়ে নিয়ে রুমালে মুখ মুছে একটা চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে একটা দামী সিগারেট ধরালেন।

একবার ভাবলুম যে বলি, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমি আমার অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু তখনি মনে পড়ল, কাল সকালেই হয়তো ভদ্রলোক সব ভুলে যাবেন, আমাকে চিনতেই পারবেন না।

আমি চুপ করে তার সোনার সিগারেট কেসটা দেখতে দেখতে ভাবলুম, এবার কেটে পড়া যাক। এখান থেকে আমার বাড়ি বেশ দূরে। এখন বাস পাওয়া যাবে কি না জানি না, অটো-রিকশর ভাড়া অনেক লেগে যাবে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কি বললে ? চলে যায়, তবু মাসে কত টাকা হয় ?

এই ধরুন পাঁচশ।

পাঁচশ ? মোটে। এতে কি আজকাল একজন ছোকরার চলে নাকি ? বিয়ে কর নি ত ?

আজ্ঞে না, বিয়ে করবার ইচ্ছে বা সাহসও নেই।

ঠিক বলেছ, বিয়ে করতে হলে সাহস দরকার, তা শোনো বাপু, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমার জন্যে আমার কিছু করা কর্তব্য।

আমার বুক দুরদুর করতে থাকে। ভদ্রলোক বোধহয় তাঁর কোম্পানিতে কোথাও একটা চাকরি বা মোটা অংকের বিজ্ঞাপনের ভার দেবেন। তবুও আমি বলি, এ কি বলছেন ? আমিতো কর্তব্য করেছি, যে কোনো লোক হলে এ কাজ করত।

তিনি এ কথায় কান দিলেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর লেখাপড়া করেছ? ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?

ভাবলাম বুঝি আমাকে চাকরিতে বহাল করে একখানা গাড়িও দেবেন। সাহস করে বলি বি এ পাস করেছি, না আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই।

ঠিক আছে লাইসেন্স করিয়ে দেবো, শোনো আমার একজন বিশ্বাসী শোফার চাই। শুধু আমার রোলসটাই চালাবে, এছাড়া আমার কিছু ব্যক্তিগত কাজ করে দেবে। তোমাকে আমি মাসে হাজার টাকা মাইনে দেবো। আমার বাড়িতে ব্রেকফাস্ট করবে, গ্যারেজের মাথায় বাথরুম সংলগ্ন থাকবার ভাল ঘর আছে। কোনো হোটেলে খাবে এবং সে বাবদ তোমাকে আরও ছশো টাকা দেবো, বাড়তি কিছু কাজ করলে বাড়তি টাকা। তুমি যে আমার ড্রাইভার তা কেউ বুঝতে পারবে না। তোমাকে কালই ভাল স্যুট কিনে দেবো। ইচ্ছে করলে তুমি আজ রাতে এখানে থেকে যেতেও পার।

ঘড়ি দেখে বললেন এখন ছানি থেকে বরোদা যাওয়ার বাস বন্ধ হয়ে গেছে। থেকেই যাও। কি? এ কাজ করবে? নাকি লজ্জা করবে?

মাইনেটা ভাল, বাড়তি সুবিধাও রয়েছে তবুও ড্রাইভারের চাকরি? মন সাড়া দিচ্ছে না। এর চেয়ে উনি যদি আমাকে একটা থোক টাকা দিয়ে দিতেন তাহলে আপত্তি করতুম না। তাই আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে বাকি সময় আমি কি করব? আপনার অফিসে কোনো একটা কাজ দিন।

হিমত, আমাদের ড্রাইভারের কোনো দরকার নেই। দৃঢ় কিন্তু সুরেলা নারীকণ্ঠ শুনে আমি চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে যেন একটা ইলেকট্রিক শক্ খেলুম। তিনি কখন ঘরে ঢুকেছেন আমি টের পাই নি। অপূর্ব সুন্দরী এক নারী। পরণে গোলাপী রঙের প্রায় স্বচ্ছ একটি নাইটি যা ভেদ করে দেহ সৌষ্ঠব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। আমার মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। বয়স তিরিশ পার হয়েছে, কিন্তু এমন সুন্দরী নারী আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি।

এই যে চন্দ্রা তুমি এখনও ঘুমোও নি? এই সুন্দর ছোকরাটির নাম অসিত চৌধুরী, এই ছোকরা না থাকলে এতক্ষণ তুমি বিধবা হয়ে যেতে। সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে অসিত আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। এর জন্য আমি

অসিতের কাছে কৃতজ্ঞ, আশা করি তুমিও একটু হেসে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

চন্দ্রা আমাকে চেয়ে দেখলেন এবং ভাল করেই দেখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আমার স্বামী এখন যে অবস্থায় রয়েছে তাতে তার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি কি সত্যিই ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ?

বল অসিত কি হয়েছিল, আমি বললে আমার কথা চন্দ্রা বিশ্বাস করবে না। হিমতভাই একটু হেসে বললেন।

হ্যাঁ, মিস্টার শা অন্যমনস্ক ছিলেন, আমি না ধরে ফেললে উনি সত্যিই একটা চলন্ত ডবল ডেকারের তলায় চাপা পড়তেন। কিন্তু এ আর কি··· আমি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ জানাতে যাচ্ছিলুম কিন্তু আমার প্রতি মহিলার ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে আমি থেমে গেলুম।

এ আর কি করেছ? আমি হলেও করতুম, তাছাড়া ডবল ডেকারের ড্রাইভারটা যে ব্রেক কসত না তা তুমি জানলে কি করে?

সে কি চন্দ্রা! ড্রাইভারের ব্রেক কসার সময় ছিল না, আমি আজ ঠিকই মরতুম, না. না, তুমি ওকে ধন্যবাদ জানাও।

থাম তোমার কাছ থেকে আমি কিছু শুনতে চাই না। কথা শেষ করে হিমত ভাইয়ের গোল্ডকেস থেকে একটা সিগারেট বার করে নিজেই ধরালেন।

আমার তখন মাথা ঘুরে গেছে। শিরায় শিরায় রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। চাকরিটা নিলে আমি এই মহিলাকে দেখতে পাব, মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে কথা বলতে পাব, হয়তো পাশে বসতেও পাব। আমি হিমত ভাইয়ের দিকে চেয়ে বলি, ঠিক আছে মিঃ শা আমি এই চাকরি নিলুম, আমার ভালই লাগবে।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে কি সাংঘাতিক চক্রান্তে পা দিলুম তা কি তখন জানতুম?

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু কুঁচকে চন্দ্রা বললেন, তা বলে অজ্ঞাত-কুলশীল একজন ছোকরাকে তুমি চাকরি দেবে?

ওসব পরে খোঁজ করে দেখা যাবে এখন, তুমি এখনি কাজে লেগে যাও অসিত, গাড়িখানা গ্যারেজে তোলা হয়ে গেছে। কাল আমাকে অফিসে

পৌঁছে দিয়ে, ফেরার পথে তোমার মালপত্র নিয়ে আসবে। এই নাও তোমার ঘরের চাবি। সকাল সাড়ে নটায় আমি বেরোব।

আমি চাবিটা হাতে নিয়ে বললুম, থ্যাংক ইউ স্যার।

স্যার শব্দটি উচ্চারণ করে আমি হিমতভাইয়ের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক পাকা করে নিলুম। আমি মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত। আপাততঃ না হয় ড্রাইভারের চাকরিই করলুম, স্বাধীন ভারতে সব কাজেরই মর্যাদা আছে। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে অন্য প্রস্তাব করা যাবে।

ঠিক আছে অসিত, তুমি তা হলে এখন যাও। আজ আমি ক্লান্ত, এখনই শুয়ে পড়ব। এইখানে এস ঐ দেখ তোমার ঘর, হিমতভাই আমার কাঁধে হাত রেখে ঘর দেখিয়ে দিলেন।

গুড নাইট স্যার, গুড নাইট ম্যাডাম।

হিমতভাই বললেন, গুড নাইট। কিন্তু ম্যাডাম আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না। আমি চাবি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

গ্যারেজটা বিলডিং-এর বাইরে নয়, বিলডিং সংলগ্ন। চারখানা গাড়ি থাকতে পারে এমন প্রশস্ত গ্যারাজ এবং তার ওপর চারজন ড্রাইভার আরামে থাকার মতো চারটে ঘর। প্রতিটি ঘর পৃথক।

ড্রাইভারের থাকার ঘর দেখে আমি অবাক। ঘর বেশি চওড়া নয়, তবুও বারো ফুট ত হবেই। লম্বা অনেকটা, বোধহয় কুড়ি ফুট। সামনের দিকে গ্রিল দেওয়া চওড়া জানালা, স্প্রিং-এর গদি বসানো খাট, গদি আঁটা বসবার চেয়ার, লেখবার টেবিল, দেওয়ালে বড় আয়না, আয়নার নিচে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম রাখবার শেলফ, ছোট একটা আলমারি, মাথায় সিলিং ফ্যান। এছাড়া ঘরের মধ্যে জলের বেসিন ফিট করা একটা টেবিল, টেবিলের ওপর একটা জনতা স্টোভ এবং হিটার। টেবিলের নিচে তাক রয়েছে। তাকে কয়েকটা ডিস, প্লেট, চামচ ছুরি, চা চিনি, কফি, দুধ ইত্যাদি রয়েছে। আরও কিছু আছে বোধহয়, পরে দেখা যাবে। দেওয়ালে কয়েকটা ছবি সাঁটা রয়েছে।

আবদুল না কি একজন এই ঘরে থাকত। লোকটা আগোছালো ছিল। কাল সকালে ঘরখানা ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়ে নিতে হবে। আপাততঃ

শুয়ে পড়া যাক। হিমতভাই বলে দিয়েছেন সকালে নটায় গাড়ি নিয়ে রেডি হয়ে থাকতে। উনি ঘড়ির কাঁটা ধরে বাড়ি থেকে বেরোন।

কাল এই প্যান্ট শার্ট পরে গাড়ি নিয়ে বেরোতে হবে। অতএব আজ রাত্রিটা জাঙিয়া পরেই শুই। জুতো মোজা খুলে জুতোর র‍্যাকে রেখে দিলুম। প্যান্ট শার্ট খুলে ভাঁজ করে বালিসের তলায় রেখে গেঞ্জি খুলে শুতে যাব, এমন সময় দরজায় কে ঠক ঠক করে নক করল।

আমি ভাবলুম নিশ্চয় কোনো ভৃত্য হবে, তাই আর প্যান্ট বার করলুম না, একটা তোয়ালে ঝুলছিল, সেইটে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলতেই দেখি দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মিসেস চন্দ্রা!

আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। কি ব্যাপার? এখন গাড়ি বার করতে হবে? ঘরে ত ইন্টারকম টেলিফোনত রয়েছে, তিনি তো সেই ফোনে বললেই পারতেন। তবে কি ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেম!

মিসেস চন্দ্রা তাঁর নাইটির ওপরে একটা মিলেসের চাদর জড়িয়ে এসেছিলেন, সেইটে ঠিক করতে করতে বললেন, শোনো অসিত আমাদের এখন কোনো ড্রাইভারের দরকার নেই, হিমতভাই তোমার প্রতি হয়তো কৃতজ্ঞ তাই ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছেন, ওর শরীরটাও আজ ভাল নেই।

কিন্তু ম্যাডাম মানে বহিনজী আমাকে ও মিঃ শা চাকরিটা দিলেন, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

আরে তাকে আবার জিজ্ঞাসা করার কি আছে? সে নিজেও জানে তার এখন ড্রাইভারের দরকার নেই, তুমি চলে যাও।

মিস্টার শাকে জিজ্ঞাসা না করেই চলে যাব? সেটা অভদ্রতা হবে না? বেশ ত তিনি নিজেও যখন জানেন তাঁর ড্রাইভারের দরকার নেই তখন কাল সকালে যখন তাঁর শরীর ও মেজাজ আরও ভাল থাকবে তখন তাঁকে বলেই চলে যাব। তাছাড়া বাহনজী আমি এত রাতে ছানি থেকে বরোদা যাব কি করে? বাস ত বন্ধ হয়ে গেছে।

অটো রিকশা পাবে। আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি, তুমি এখনই চলে যাও, আগের লোক ত মাইনেই পায় নি। আর দেরি কোরো না, নাও জামা প্যান্ট পর।

আমার জেদ চেপে গেল। আমি যাবনা। ভদ্রতা করে বললুম, মাইনে না পেলেও থাকব, খুবই কষ্টে ছিলুম. থাকবার একটা ভাল জায়গা পেয়েছি, আর আপনি নিশ্চয়, দুটো খেতে দেবেন, আপনি দেখবেন বহিনজী আমি আপনাদের ভাল সারভিস···

আরে এ তো আচ্ছা লোক, বলছি চলে যাও তবুও যাবে না। দেখছ না বাড়িতে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। আমাদের লোক রাখবার ক্ষমতা নেই, হিমত ভাইয়ের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক ভাল চলছে না, কোম্পানি ওকে তাড়িয়ে দেবে। তখন আমরা কোথায় থাকব তারই ঠিক নেই। তার ওপর আবার ইনি থাকতে চাইছেন। এই নাও এই একশ টাকার নোটখানা নিয়ে কেটে পড়, আর জ্বালিয়ো না।

আমি তো ও টাকা পাবার মতো কিছু করি নি বহিনজী, টাকা আমার চাই না। আমি আপনার সব কথা শুনলুম, আমি না হয়ঃ কাল সকালে মিস্টার শাকে একবার বলে চলে যাব। কারণ চাকরিটা তিনিই আমাকে দিয়েছেন।

বেশ তাই কোরো কিন্তু পরে যেন আমাকে দোষ দিয়ো না, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছি, বোকা কোথাকার। আচ্ছা সত্যি বলত, তুমি কি আজ হিমতভাইয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছ?

আমি প্রাণ বাঁচাবার কে বহিনজী? ওঁর আয়ু ছিল উনি বেঁচে আছেন, আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র। তবে বহিনজী যদি আগে জানতুম যে আপনি চান মিস্টার শা মারা যান, তাহলে আমি ছুটন্ত ডবল ডেকারের ভারি চাকার সামনে ওঁকে না হয় ধাক্কা দিয়ে ফেলেই দিতুম, টেনে নিতুম না+

আমি তো তোমাকে ন্যাকামো করতে বলিনি, ইডিয়ট কোথাকার!

চন্দ্রা আর দাঁড়ালেন না, তোমার নিজের মরবার যখন এত সাধ, তখন মরো—বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন।

হায় আমি যদি চন্দ্রা শায়ের কথা সে রাতে শুনতুম এবং গ্রীনপার্ক ছেড়ে চলে যেতুম!

বরোদায় তথা পশ্চিম ভারতে সূর্য ওঠে দেরিতে এবং অস্ত যায় দেরিতে। তার মানে সকাল ছোট? বিকেল বড়। আমরা পুব ভারত তথা কলকাতায়

ছেলে, সূর্যোদয়ের পর ঘুম থেকে উঠতুম কিন্তু বরোদায় সূর্য ওঠবার অনেক আগেই আমার ঘুম ভেঙে যায়।

গ্রীন পার্কে সাড়ে পাঁচটায় সময় ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে তখন যেন অন্ধকার। তবুও উঠে পড়লুম। প্রথমেই স্থির করলুম ঘরখানা গুছিয়ে নেওয়া যাক। সেই কাজে লেগে গেলুম। সিনেমা পত্রিকা থেকে কেটে নেওয়া কয়েকটা ছবি দেওয়ালে সাঁটা ছিল। সেগুলো খুলে ফেললুম। মেঝেতে অনেক আজেবাজে কাগজ ইত্যাদি পড়ে ছিল, সেগুলো ঘরের কোণে জড করে রাখলুম। টেবিলটা অগোছালো হয়ে ছিল, সেটা ঠিক করলুম।

টেবিলের ওপর গুজরাটী একখানা সচিত্র পত্রিকা ছিল। যেটুকু গুজরাটী অক্ষর পরিচয় হয়েছিল তার দ্বারা দেখলুম পত্রিকাটির নাম 'আমাপাস'। মলাটের ওপর একটা নাম ঠিকানা লেখা রয়েছে, আবদুলভাই খালেক এবং ঠিকানা।

শুনেছিলুম হিমতভাইয়ের আগের ড্রাইভারের নাম ছিল আবদুল। এই নাম ও ঠিকানা তাহলে সেই আবদুলের। কোথায় একটা বইয়ে পড়েছিলুম মানুষের উচিত শত্রুর পরিচয় উত্তমরূপে জেনে নেওয়া। আমি মিত্র মনে করলেও চন্দ্রা শা আমাকে শত্রু মনে করে। আমিও তাকে আমার অ-মিত্র মনে করতে পারি এবং উত্তমরূপে না হলেও তার এবং তার স্বামীর কিছু পরিচয় আমি এই আবদুলভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে পারি।

হিমতভাইকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আমি লজিং হাউসে সব আমার মালপত্তর আনতে এবং সেখান থেকে ফেরার সময় আবদুল-ভাইয়ের খোঁজ করব।

যে কোনো কারণে হোক চন্দ্রা আমাকে গ্রীন পার্কে থাকতে দিতে চায় না। যাতে আমি সঙ্গে সঙ্গে বিদেয় হই সেজন্যে সে আমাকে মোটা টাকা দিতে চেয়েছিল। কেন সে আমাকে একটা রাত্তিরও থাকতে দিতে চায় নি? তারপর সে তার স্বামীকে পছন্দ করে না, শত্রুই মনে করে এবং সম্ভবত চায় স্বামীর মৃত্যু হোক। কেন? আবদুলভাই হয়তো বলতে পারে।

আলমারিটা খুললুম। দেখলুম একটা তাকে ড্রাইভারের একটা

ইউনিফরম রয়েছে এবং অপর তাকে লণ্ড্রিতে কাচানো দুই প্রস্থ বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় এবং বেডকভার রয়েছে।

আমাকে ড্রাইভারের উর্দি পরতে হবে না, অতএব ওদিকে হাত না দিয়ে বিছানা থেকে ময়লা চাদর ও বালিশের ওয়াড় খুলে নিয়ে লণ্ড্রিতে কাচানো চাদর পেতে দিলুম ও বালিশের ওয়াড় পাল্টে নিলুম। এতক্ষণে ঘরখানা যেন হেসে উঠল।

এখানে প্রচুর গাছ। জানালা দিয়ে দেখি গাছের পিছনে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়েছে। জামা প্যাণ্ট ও জুতো পরে চুল আঁচড়ালুম। দাড়ি কামানো হয় নি তাই মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। বেলা হলে বাজারে যেয়ে দাড়ি কামিয়ে আসতে হবে। আপাততঃ চা খাওয়া দরকার।

গ্যারাজ মূল বাড়ির সঙ্গে যুক্ত, কাল রাত্রে চন্দ্রা আমার ঘরে এসেছিল, তাহলে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার পথ আছে বাড়ির ভেতর দিয়েই। কিচেনে যাওয়া যাক। হিমতভাই তো আমাকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার কথা বলেই দিয়েছেন। ব্রেকফাস্ট পরে হবে। আগে ত এক কাপ চা খাই। নাথিং লাইক টি।

আমার ঘর থেকে বেরিয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরতেই কিচেনে পৌঁছে গেলুম। বেশ বড় কিচেন, আধুনিক আসবাব ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত। ফ্রিজ ছাড়াও একটা আটফুট ডিপ ফ্রিজ রয়েছে। আমি একদা ডিপ ফ্রিজ-এর সেলসম্যানগিরি করেছিলুম। অনেক হোটেলে ঘুরেছিলুম, মাত্র দু তিনটের বেশি বেচতে পারি নি। এ বাড়িতে এত বড় একটা ডিপ ফ্রিজ দেখে অবাক হলুম। পরে ভাবলুম একদা হয়তো এ বাড়িতে অনেক লোক থাকত, সেজন্যে তখন এটা কাজে লাগত।

ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ কিছু কাজ করছিল। ভাবলুম ভোরে হয়তো কাজের লোক এসেছে।

হিটার নেই, তবে ছোট একটা ইলেকট্রিক কুকিং রেঞ্জ রয়েছে। হিটার না থাকলেও বিলিতি ইলেকট্রিক কেটলি রয়েছে। চায়ের কাপডিশ টিপট, দুধ চিনি সবই পেলুম কিন্তু চা পেলুম না। ইনস্ট্যাণ্ট কফি রয়েছে। কফিই খাওয়া যাক্।

ইলেকট্রিক কেটলিতে জল ভরে গরম করতে দিলুম। জল গরম হচ্ছে

কাপে ঢেলে যখন কফি তৈরি করছি ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকল অপূর্ব সুন্দরী চন্দ্রা নামে সেই মহিলা। ঘর যেন আলো হয়ে গেল। গুজরাটী মেয়েরা পুরু কাপড়ের একটা পেটিকোট পরে যার নাম চানিয়া এবং গায়ে থাকে হ্রস্ব একটা চোলি বা ব্লাউস। চন্দ্রার পরণে দেখলুম হলদে রঙের চানিয়া, গায় হলদে ছোট ব্লাউজ, সুউচ্চ স্তনপ্রান্ত থেকে গণ্ডির অনেকটা নিচে পর্যন্ত উন্মুক্ত।

কফির কাপে চামচ নাড়তে ভুলে গেলুম। অবাক হয়ে চন্দ্রার রূপসুধা পান করতে লাগলুম।

আমাকে দেখে চন্দ্রা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, হাঁ করে চেয়ে দেখছ কি? মেয়েমানুষ কখনও দেখ নি?

বলতে যাচ্ছিলুম মেয়েমানুষ তো হাজার হাজার দেখছি কিন্তু এমন সুন্দরী দেখি নি। স্বর্ণচাঁপার মতো বর্ণ, সুডৌল নিতম্ব, নিখুঁত বক্ষযুগল, ঘন কালো চুল, সবুজ চোখ, ছবিতে আঁকা ভুরু, এমন ঠোঁট, নাক, আমি এমনটি আর দেখি নি। এক কথায় বিউটি কুইন। কিন্তু মনিব পত্নীকে তো সে কথা বলা যায় না।

চুপ করে আছি দেখে বললেন, তুমি ত হিমতভাইয়ের ড্রাইভার, এখানে কেন? তোমার ঘরে যাও।

যাই হোক আমার চাকরিটা তিনি স্বীকার করে নিলেন। আমার মুখ ফুটল, আমি বললুম, মিস্টার শা আমাকে বলেছিলেন ব্রেকফাস্ট পাবে। এখন ব্রেকফাস্ট নয়, এক কাপ চায়ের জন্যে এসেছিলুম।

কেন তোমার ঘরে চা নেই? দোকান নেই?

না বহেনজী আমার ঘরে চায়ের সরঞ্জাম আছে মাত্র আর কিছু নেই। দোকান এখন খুলেছে কি না জানি না। তাছাড়া, বাড়িতেই যদি চা পাই তাই খুঁজে খুঁজে কিচেনে এসেছিলুম।

বেশ করেছ, আমার মাথা কিনেছ। এখন বিদেয় হও।

কিন্তু বহেনজী আমি কি আপনারও কোনো কাজ করতে পারি না?

ঢের হয়েছে, আমি নিজের কাজ নিজেই করতে পারি। তিনি আর দাঁড়ালেন না। কি খুঁজতে এসেছিলেন সেটা নিয়ে চলে গেলেন।

একটা জারে কিছু বিস্কুট ছিল। চার পাঁচটা বিস্কুট ও দু কাপ কফি

খেয়ে আবার সব ধুয়ে পরিষ্কার করে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেলুম।

কিচেন থেকে গ্যারাজে এলুম। গাড়িখানা দেখলুম। ধোয়া দরকার। নিজের ঘরে ফিরে আগেকার ড্রাইভারের শুধু প্যান্টটা পরে নেমে এসে গাড়ি বার করে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেললুম।

গাড়ি বাইরেই রইল, গ্যারাজে তুললুম না। রোদ পড়ে গাড়ি ঝকঝক করছে। এই রোলসখানা যদি আমার হত!

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে জামা প্যান্ট পরলুম। এবার বাজার যাওয়া যাক। দাড়ি কামিয়ে কিছু খেতে হবে, ন'টা বাজতে এখনও দেরি আছে।

বাড়িতে কোনো কাজের লোক দেখছি না কেন? বাগানে মালি নেই, ঘর পরিষ্কার করবার, বাসন ধোবার, কাপড় কাচবার লোকজন কোথায়? এতবড় বাড়ির রান্নাবান্না সব কাজ কে করে? একটাও লোক নেই কেন? এত বড় বাগান কিন্তু মালি নেই। আমার খুব অবাক লাগল।

ছানি বাস স্ট্যাণ্ডে একটা সেলুনে ঢুকে দাড়ি কামালুম। তারপর, কিছু ভাজিয়া ও চা খেয়ে, গ্রীন পার্কের দিকে চললুম। চা এরা বেশ ভালই করে। মুখটা তেতো হয় না।

গ্রীন পার্কে ফিরে এসে বাগানটা দেখতে লাগলুম। ভেবেছিলুম বাড়িতে আর কেউ না আসুক খবরের কাগজওয়ালা আসবে। রাস্তা দিয়ে কত কাগজওয়ালা চলে গেল কিন্তু গ্রীন পার্কে কেউ ঢুকল না।

বাগান বা বাড়ি যে অপরিচ্ছন্ন বা এলোমেলো অবস্থায় আছে তা নয়, তবে যে খুব ঝকঝকে অবস্থায় আছে তাও নয়। তাহলে বোধহয় মাঝে মাঝে ঠিকে লোকের সাহায্যে সব পরিষ্কার করিয়ে নেওয়া হয়।

কিন্তু ব্যাপারটা কি? হিমতভাই যেমন ধনী তাতে তাঁর পাশে ড্রাইভার ও বাগানের মালি সমেত দশ বারোজন লোক নিয়োগ করা তো কিছুই নয়,তবু বাড়িতে স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর একটিও মানুষ নেই কেন? এমন কি রান্না করার জন্যেও পাচিকা বা কুক নেই। ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় লাগল।

বাগান দেখে গ্যারাজে গেলুম। সাহেব বলেছেন সাড়ে নটায় বেরোবেন, এখনও অনেক দেরি আছে। গাড়িটা দেখলুম, ধোওয়া দরকার। গাড়ি ধোবার জলের ব্যবস্থা রয়েছে, গাড়ি পরিষ্কার করবার সকল সরঞ্জাম যথা

ঝাড়ন, শ্যাময় লেদার, বুরুষ, পালিশ সবই রয়েছে। গ্যারাজ বেশ প্রশস্ত, বাইরে বার করবার দরকার নেই।

গাড়ি ধোবার জন্যে দেওয়ালে নীল রঙের একটা ওভারঅল ঝুলছে। আমি সেটা পরে নিয়ে গাড়ি ধোয়ার কাজে লেগে গেলুম। গাড়ির চেহারা ফিরে গেল। গাড়িখানা বাইরে বার করে আমি আমার ঘরে ফিরে গেলুম।

নিজেকে একটু ফিটফাট করে নিয়ে ঠিক নটা পঁচিশ মিনিটে গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে বসে রইলুম। হিমতভাই বলেছেন সাড়ে নটায় অফিসে যাবেন।

সয়াজী রাও গাইকওয়াড়ের রাজত্বকাল থেকে বরোদা রাজ্যের গ্রামে গ্রামে একটা করে ক্লক টাওয়ার আছে। দেশ স্বাধীন হবার পর সেই ঘড়ি-গুলো চালু আছে, কাছেই ছানি গ্রামেও একটা ক্লক টাওয়ার আছে।

টাওয়ারের ঘড়িতে সাড়ে নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দেখি হিমতভাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমি তাঁকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দাঁড়ালুম।

পরনে গ্রে-রঙের লাউঞ্জ স্যুট, মাথায় টুপি, হাতে ব্রিফ কেস। চকচকে জুতো ও নিভাঁজ স্যুটের তুলনায় ব্রিফকেসটা কিছু মলিন। অনেকে আছেন পুরাতন ব্রিফকেস বদলাতে চান না, বলেন এটি আমার লাকি ব্রিফকেস। দরজা বন্ধ করে নিজের সিটে বসবার আগেই শুনলুম উনি বললেন, মর্নিং অসিত, ব্রেকফাস্ট খেয়েছ ?

আজ তো প্রথম দিন, চা আর ভাজিয়া খেয়েছি।

ওতে ত হবে না, এই নাও নোটখানা রাখ। ফেরবার পথে, ব্রেকফাস্টের জন্যে চা কফি দুধ মাখন জেলি ডিম যা দরকার কিনে রাখবে। আমাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে তোমার সেই লজিং হাউসে খেয়ে তোমার স্যুটকেস আর বেডিং নিয়ে আসবে। ফেরবার পথে কোথাও লাঞ্চ করে নেবে।

তিনি আমার হাতে একটা একশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, আর শোনো অমনভাবে সাধারণ ড্রাইভারের মতো দরজা খুলে দাঁড়াতে হবে না। তুমি লেখাপড়া জানা ছোকরা, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করবে।

যেমন ছেলে বাপকে, ভাই দাদাকে, স্ত্রী স্বামীকে গাড়ি চালিয়ে অফিসে পৌঁছে দেয় তুমিও সেইরকম আর কি।

ঠিক আছে স্যার।

আমি অফিসে গিয়ে এলপিতম সেণ্টারে ফোন করে দেবো, সেখান থেকে তুমি তিনটে স্যুট এবং আর যা জামাকাপড় দরকার সেগুলো নিয়ে নেবে। আমার নামে বিল হবে, আর একটা হোটেলে ফোন করে দেবো, সেখানে রোজ লাঞ্চ আর ডিনার খাবে। ওরা একটা কার্ড দেবে, না বিলিতি খানা নয়, দেশী খানাই। দিনে ভাত মাছ, রাতে রুটি মাংস বা ডিম এই আর কি।

তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো বরোদায় নতুন এসেছ, নর্মদাভ্যালি ইণ্ডাস্ট্রির অফিস চেনো ?

চিনি স্যার। আর সি দত্ত রোডে 'নর্মদা কোর্ট'। আমি একদিন বিজ্ঞাপনের চেষ্টায় ঐ অফিসে পি-আর-ও মিসেস ভারুচার কাছে গিয়েছিলুম। তিনি বলেছিলেন তখন বাজেট নেই, ইয়ার এণ্ডে দেখা করতে।

ও তাহলে তুমি আমাদের অফিস চেনো। ঠিক আছে চল। একটু তাড়াতাড়ি চল তো। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে একটু দাঁড়াবে। একখানা ইকনমিক ডেলি কাগজ কিনতে হবে।

বরোদা বাসস্ট্যাণ্ড বেশ বড়। একটা রেলওয়ে স্টেশনের মতো। বাইরে তিন চারটে নিউজ স্ট্যাণ্ড আছে। সেখান থেকে কাগজ কিনে ওঁকে আমি অফিসে পৌঁছে দিলুম।

অফিসে পৌঁছে হিমতভাই বললেন চল, আমার চেম্বারটা চিনে আসবে চল। ঠিক চারটের সময় আমাকে নিয়ে যাবে।

মস্ত বড় অফিস, অনেক ডিপার্টমেণ্ট, অনেক চেম্বার। লক্ষ্য করলুম যে লিফটম্যান থেকে শুরু করে অফিসের কোনো বেয়ারার বা কোনো ব্যক্তি হিমতভাইকে স্যালুট করল না, কেউ তাঁকে দেখেও যেন দেখল না, কেউ যেন তাঁকে চেনেই না।

তিনি চেম্বারে ঢুকলেন। বেশ বড় চেম্বার, মেঝেতে কার্পেট পাতা, বেশ বড় টেবিল, ওধারে এক্সিকিউটিভ চেয়ার, একটা ফাইল ক্যাবিনেট ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো আসবাব নেই। না, এদিকে বোধহয় একটা

কাবার্ড আছে। টেবিল পরিষ্কার, একখানাও কাগজ বা ফাইল নেই, এমন কি টেলিফোনও নেই।

কে জানে টেলিফোন হয়তো টেবিলের আড়ালে আছে আর ফাইল ও কাগজপত্র পেপারওয়েট ইত্যাদি সরঞ্জাম হয়তো টেবিলের ড্রয়ারে আছে। সেক্রেটারি এসে সব হয়তো গুছিয়ে দেবে। উনি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন—অসিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে চন্দ্রার কাজে সাহায্য করবে।

আমি বললুম উনি আমার কোনো সাহায্যই চান না।

কথাটা তিনি হয় শুনতে পেলেন না কিংবা শুনেও শুনলেন না। সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তাহলে ঠিক চারটের সময় এস।

অফিস থেকে বেরিয়ে একটা মিষ্টির দোকানে কিছু খাবার খেয়ে নিলুম। কিছু মিষ্টি রুটি আর তরকারি সঙ্গে নিলুম, নিজের ঘরেই লাঞ্চ করব। আর চা কফি রুটি মাখন ও নানখাটাই কিনলুম সকালে ব্রেকফাস্ট করবার জন্যে। চিনি আর দুধ কিনলুম না, ও দুটো ঘরে শেলফে ছিল। যতটা পারা যায় পয়সা বাঁচানো যাক। কে জানে কখন তাড়িয়ে দেবে।

গ্রীন পার্কে ফেরবার পথে আগেকার ড্রাইভার আবদুলের বাড়ি। ছানি রোডের একটা ঠিকানা দেওয়া ছিল। আমাকে ছানি রোড দিয়েই ফিরতে হবে।

নটরাজ সিনেমার কাছে একটা গলির মধ্যে আবদুলের বাড়ি। পৌঁছে দেখলুম পাজামা ও গেঞ্জি গায়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে একজন এক বালতি জল নিয়ে ওপরে উঠছে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আবদুল ভাই কোথায় থাকেন বলতে পারেন?

আমিই আবদুল। আপনি কে? আসুন, একটু সাবধানে উঠবেন। ঘরে ঢোকবার পর আমাকে বসতে বলে জলের বালতিটা ঘরের এক কোণে রেখে বলল, আমি যখন বালতিতে জল ভরছিলুম তখনি আপনাকে রোলস থেকে নামতে দেখে বুঝতে পেরেছি যে আপনি নতুন ড্রাইভার, তাই নয় কি?

আপনি ঠিকই ধরেছেন, তবে উনি আমাকে ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি করেছেন, সে যাই হোক আমি আপনার কাছে কিছু জানতে এসেছি।

আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কোথায় ?

ঘরে 'আমাপাস' নামে পুরনো একটা ম্যাগাজিন ছিল। তাতে আপনার নাম ঠিকানা লেখা ছিল।

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে আবদুল ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে চা-ওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দুটো চা। তারপর ঘরে ফিরে বললেন, তাহলে আপনি হিমতভাইয়ের চাকরি নিয়েছেন কিন্তু ওখানে ত কোনো লোক টিকতে পারে না, হালে আমিই বোধহয় সবচেয়ে বেশি দিন লেগে ছিলুম. একমাস, আপনার নামটি কি ভাই ?

নাম বললুম, অসিত চৌধুরী।

বাঙালী ? নতুন এসেছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। বয়স চল্লিশ পার হয়েছে, কানের দুপাশে চুলে পাক ধরেছে। ফুর্তিবাজ মানুষ বলে মনে হল। আমি তাকে একটা ও নিজে একটা সিগারেট নিয়ে বললুম —আপনাকেও ত গুজরাটী বলে মনে হচ্ছে না।

ঠিকই ধরেছেন, আমি দিল্লীর লোক, বছর পাঁচেক হল ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছি। আর চাকরি করব না। একটা অটো রিকশার লাইসেন্স পেয়েছি, তা আপনি এই চাকরিটা কি করে পেলেন ?

চা এসে গিয়েছিল। সিগারেট ধরিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলুম। কাপ প্রতি ষাট পয়সা দাম নেয় বটে কিন্তু চা-টা বেশ ভালই করে।

কি করে চাকরি পেলুম সে ইতিহাস সবিস্তারে পেশ করে প্রশ্ন করলুম, ব্যাপারটা কি মশাই ? লোক টেকেনা কেন ? বাড়িতে ত একটাও কাজের লোক দেখলুম না। তারপর দেখলুম বাড়ির গৃহিণী চান না যে আমি আর এক মিনিটও ঐ বাড়িতে থাকি।

আরে ঐ মহিলা তো ডেঞ্জারাস, ও আপনাকে বিপদে ফেলবে। আপনি বরঞ্চ তার আগেই চাকরিটা ছেড়ে দিন। আমাকে ত চোর বলেছিল। আমাকে কথায় ভুলিয়ে বা ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারছিল না। কারণ চাকরিটা আমার পছন্দ হয়েছিল, খাটনি একদম ছিল না। সপ্তাহ শেষে চুক্তি অনুসারে সাহেব আমার মাইনে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া সকালের

নাস্তা আর দুপুর ও রাতের খাওয়া ফ্রি, আরামের চাকরি। যাইহোক মেমসাহেব আমাকে তাড়াতে না পেরে একদিন সকালে আমি গাড়ি বার করবার আগে আমাকে একখানা একশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, সাহেবকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে ফেরবার পথে পেট্রলের বিল যেন মিটিয়ে দিয়ে আসি। আমার সন্দেহ হল, কারণ আমি দেখেছি কর্তা গাড়িতে বসে ওদের চেক কেটে দিয়েছেন। তারপর নোটখানা উলটে পালটে দেখলুম এক কোণে খুব ছোট অক্ষরে সবুজ বল পেন দিয়ে লেখা রয়েছে চন্দ্রা। আমার সন্দেহ হল। আমি কিছু বললুম না। নোটখানা পকেটে পুরে বললুম, ঠিক আছে মেমসাহেব, অফিস যাবার পথে তো সময় হবে না, আর যখন ফিরি তখন পেট্রল পাম্পের মালিক থাকে না। বিকেলে সাহেবকে আনতে যাবার সময় টাকাটা দেবো। মেমসাহেব বললেন, তাহলে আজই জমা দিয়ো, ভুলো না, নোটখানা সাবধানে রেখ।

ইনসাইড পকেটে নোটখানা রেখে আমি গাড়ি বার করতে নেমে এলুম। আমার তো সন্দেহ হয়েছেই, তাই ফেরবার পথে আমি আমার বন্ধুর দোকানে নোটখানা গচ্ছিত রেখে বাড়ি ফিরে গ্যারাজে গাড়ি তুলে নিজের ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দুজন পুলিস এসে হাজির।

কি ব্যাপার মশাই? আমি জিজ্ঞাসা করি।

আপনার নামে সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে। মিসেস চন্দ্রাবেল শা অভিযোগ করেছেন যে প্রায়ই তাঁর ক্যাশ টাকা চুরি যায়। আপনাকে তাঁর সন্দেহ হয়। আমরা প্রথমে আপনার বডি সার্চ করব, পরে ঘর।

আমার বডি সার্চ করতে হবে না। আমি জামা কাপড় সব খুলে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন।

পুলিস অবশ্য শেষ পর্যন্ত কিছুই পেল না। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আজ সকালে মিসেস শা আপনাকে একখানা একশ টাকার নোট দিয়েছিলেন। সে নোট কোথায় গেল?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়ি। আমাকে তিনি নোট দিতে যাবেন কেন? আমার মাইনে এবং গাড়ির যাবতীয় বিল তো সাহেব নিজে চেক কেটে দেন। আমাকে হয়রান করার কারণ? আমি এখন থানায় মিসেস শায়ের নামে পাল্টা অভিযোগ করব।

পুলিস চলে যাবার পর আমি আমার মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে গ্রীন পার্ক থেকে চলে এলুম। একশ টাকার নোটখানা আমি আমার বকেয়া মাইনে বাবদ নিয়ে নিলুম। ভাগ্যিস নোটখানা নিজের কাছে রাখি নি।

মনে মনে ভাবলুম তুমি একটি ঘুঘু কিন্তু মহিলা তো সাংঘাতিক। আমাকেও ত টাকা দিয়েছিলেন। সে টাকা নিলে আমিও হয়তো বিপদে পড়তুম। পুলিস কি আর আমার কথা বিশ্বাস করত।

কিন্তু মিঃ আবতুল ব্যাপারটা কি? উনি স্বামীর জন্মে ড্রাইভার রাখতে চান না কেন?

তা ত আমি বলতে পারব না। চাকরিতে বহাল হবার সময় আমি দেখেছি তুজন কাজের লোক, একজন বাবুর্চি আর একজন মালি ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন সকলকে জবাব দিলেন। বেশির ভাগ ঘর বন্ধ করে দিলেন। কি হল বুঝলুম না।

মিসেস চন্দ্রাবেল আমাকে বলেছিলেন সাহেবের নাকি আর টাকাপয়সা নেই, এমন কি লোকজনের মাইনে দেবার আয়ও তাঁর নেই।

তা আমি জানি না, তবে তু পাঁচটা লোক পোষবার মতো টাকা ও ক্ষমতা সাহেবের নিশ্চয় আছে।

আমি আজ ওর অফিসে গিয়েছিলুম, ওঁর চেম্বারেও ঢুকেছিলুম। আমার মনে হল উনি যেন অফিসের কেউ নন, কেউ ওঁকে চেনেও না এবং অফিসে ওঁর কোনো কাজও নেই। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলতে পারেন?

দেখুন ভাই এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল, তবুও আপনাকে আমি বলছি, কাউকে বলবেন না। নর্মদা ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা হিমতভাই স্বয়ং, উনিই কোম্পানির সর্বেসর্বা, কোম্পানির বোর্ডের মৌখিক বা লিখিত অনুমোদন না নিয়েই তিনি অনেক কাজ করতেন, এজন্মে বোর্ডের অন্যান্য মেম্বাররা অসন্তুষ্ট ছিল। গত বছর তিনি বুঝি কারও অনুমোদন না নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে দেড় কোটি টাকার মেসিনারির অর্ডার দিয়েছিলেন। মেসিন যখন বম্বে পোর্টে এসে পৌঁছল তখন কোম্পানির তহবিলে অত টাকা ছিল না। অথচ মেসিনগুলি ফেরত দেওয়া যায় না কারণ ওগুলির দরকার তো ছিলই উপরন্তু কোম্পানির প্রেস্টিজ আছে। যে সুইশ ব্যাংকের মারফত মাল ছাড়াবার চালান ও বিল এসেছিল সেই ব্যাঙ্ক তাগাদা দিতে,

লাগল। ওদিকে মাল ছাড়াবার সময়ও পার হতে চলেছে নইলে ডেমারেজ দিতে হবে। অতএব কোম্পানিকে টাকা ধার করে মাল খালাশ করতে হল।

কিন্তু নর্মদা ইণ্ডাস্ট্রিজ তো বিরাট কোম্পানি, ওদের কাছে দেড় বা পৌনে দু কোটি টাকা কিছুই নয়।

ঠিকই, তবে সব সময়ে কোম্পানির তহবিলে অত টাকা নাও থাকতে পারে। তাছাড়া মাত্র এক সপ্তাহ আগে কোম্পানিকে অন্য মেসিনারি বাবদ প্রচুর টাকা পেমেণ্ট করতে হয়েছিল। শিপিং কোম্পানি, এয়ার লাইন্স, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি ও ঠিকাদারদের প্রচুর বিল মেটাতে হয়েছিল। এমন কাজ এই প্রথম নয়, তাই কোম্পানির এক্সট্রা অর্ডিনারি মিটিং ডেকে হিমতভাইয়ের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। শুধু তাঁকে ডিরেকটরের পদটি তাঁর টার্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাখতে দেওয়া হল, কোনো ক্ষমতাই রইল না

অসিত বলল, তাহলে তিনি নামেই শুধু ডিরেকটর, কাজে কিছুই নয়। তাই আমি ওঁর টেবিলে কোনো কাগজ বা ফাইল দেখি নি। মেমসাহেব আমাকে বলেছেন হিমত মাইনে দেবে কোথা থেকে, ওর ত কোনো আয় নেই।

আয় বা টাকা পয়সার কথা কিছু জানি না, তবে কিছু আয় তো আছে, নইলে সবকিছু চলছে কি করে ?

তা হিমতভাই যদি এমন করিৎকর্মা লোক তাহলে উনি ঐ কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোম্পানিতে যাচ্ছেন না কেন ?

একটা কারণ, একবার বদনাম রটে গেলে অন্য কোম্পানিতে যাওয়া মুশকিল। নিজে একা যে নতুন কোনো ব্যবসা আরম্ভ করবেন তার জন্য ত মূলধন চাই। সে মূলধন আছে কি না জানি না, তবে হিমতভাইয়ের মস্ত একটা দোষ কি লক্ষ্য কর নি ?

কি দোষ বলুন তো ? লোকটা যেন সর্বদা মদে চুর হয়ে আছে ? সকালে তো সেরকম বুঝলুম না। তবে রাতে সে চেহারা দেখেছি।

হিমতভাই সব সময়েই মদে চুর হয়ে থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ব্রেকফাস্টের সময় থেকে ড্রিংক করতে আরম্ভ করে এবং সেই ড্রিংক চলতে থাকে রাত্রে শোওয়ার সময় পর্যন্ত নন স্টপ। এই ড্রিংক আর ওর পতনের মূলে কে জানেন ?

ঠিক বলতে পারছি না, অন্য কোনো মেয়েমানুষ বা জুয়ো খেলার রোগ আছে নাকি ?

না না ওসব নয়, হিমতভাইয়ের ওসব দোষ নেই, ওর দুষমন হল ওর ঐ শয়তান বৌ, আমাদের দেশী মেয়েদের কখনও সবুজ চোখ দেখেছেন ? সবুজ চোখী মেয়ের আলাদা একটা রূপ থাকতে পারে কিন্তু ওরা সর্বনাশী। বিয়ের আগে এক জ্যোতিষী হিমতভাইকে সতর্ক করে দিয়েছিল, ও মেয়েকে বিয়ে কোরো না, ও অলক্ষুণে মেয়ে, তোমার সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে। ঐ বাড়িতে ত চন্দ্রার আলাদা ঘর আছে, সে ঘরে তো ও স্বামীকে ঢুকতে দেয় না, স্বামী ঢোকেও না।

মেয়েটা কে ? এলই বা কোথা থেকে ?

এ শহরে আগে আমরা ওকে দেখি নি। বিয়ে ত হয়েছে মাত্র বছর দুয়েক। এরই মধ্যে হিমতভাইয়ের সর্বনাশ করে ছেড়েছে। হিমতভাই আর মাসখানেক ডিরেকটর পদে আছে, তারপর কোম্পানি ওকে তাড়িয়ে দেবে। এদিকে ওর কোনো আয় নেই, আছে শুধু ব্যয়। অতএব তুমি যদি ভেবে থাক যে তুমি পাকা একটা ভাল চাকরি পেয়েছ তাহলে ভুল করেছ, বড়জোর সাতদিন তোমার চাকরি থাকবে। ও মেয়ে সাংঘাতিক। তোমাকে তাড়াতে না পারলে কোনো দিন কোথাও তোমার সামনে জামাকাপড় ফেলে দিয়ে লোক ডেকে জড় করবে।

কিন্তু হিমতভাইয়ের এখনও তিনটে দামী গাড়ি আছে। ভাল অবস্থাতেই আছে, বেচলে দু লাখ ত পাবেই, তার ওপর অমন একখানা বাড়ি, চন্দ্রার অলংকারও আছে বোধহয়।

তা তো আছে কিন্তু শুনেছি হিমতভাইয়ের ঋণও আছে প্রচুর। অফিস থেকে বেরিয়ে এলেই দেনাদাররা ওকে ছেঁকে ধরবে। তবে ওর বৌ তো অসাধারণ সুন্দরী, ইচ্ছে করলে অপর ধনীর মাথা ঘুরিয়ে অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু তা কি করবে ? আচ্ছা ভাই আমাকে এখনি একবার বেরোতে হবে, অটো রিকশার পারমিটের কি হলো খোঁজ নিতে হবে। হিমতভাই খুব ভাল লোক, ব্যবহার খুব ভাল কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি লোকটাকে তো স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। নইলে অমন মনিব লাকে মেলে। ওঁর জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হয়।

আবদুলের বাড়ি থেকে আমি লজিং হাউসে গিয়ে আমার স্যুটকেস ও বেডিং নিয়ে গ্রীনপার্কে ফিরে এসে দোকান থেকে কিনে আনা খাবার খেতে খেতে মনে মনে ঠিক করলুম কিছুতেই চাকরি ছাড়ব না। মহিলার মতলবটা কি? কেন ও বাড়িতে লোক রাখতে চায় না জানতেই হবে। আমার জেদ চেপে গেল।

গ্রীণ পার্কে ফিরে এসে দেখলুম ক্যাডিলাক গাড়িখানা নেই। ঐ গাড়িখানা চন্দ্রা চালায়। বোধহয় লাঞ্চ করতে গেছে। তাহলে বাড়ি এখন ফাঁকা।

সদর গেটে তালা বন্ধ কিন্তু আমাদের গ্যারাজের ওপরে যে ঘর আছে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির ভিতরে যাবার পথ আছে। বাড়িতে অনেকগুলো ঘর আছে। বেশির ভাগ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ, শুধু তিনটে ঘর খোলা। খোলা মানে দরজায় তালা বন্ধ, জানালাগুলো খোলা। কিচেন, পাশে একটা স্টোর এবং একটা বাথরুম খোলা আছে।

চন্দ্রার ঘরখানা মস্তবড়। মস্তবড় খাট, একদিকে ড্রেসিংটেবল, এক কোণে জাপানী পার্টিশন, ওধারে চন্দ্রা শাড়ী বদলায়। বাথরুমের দরজাও দেখা যাচ্ছে, একদিকে বসবার সোফা সেটি সেন্টার টেবিল, ফুলহীন ফুলদানি, রুপোর অ্যাশট্রে, মেঝেতে কার্পেট।

সে তুলনায় হিমতভাইয়ের ঘর অনেক ছোট এবং কিছু অপরিষ্কার। আমিই একসময়ে ঘরে ঢুকে পরিষ্কার করে দেবো। ঘরের সবদিকেই অযত্নের ছাপ স্পষ্ট।

বাড়িখানা দোতলা। একতলা ও দোতলা ঘুরে দেখতে আমার বেশি সময় লাগল না। যে-ঘরগুলোয় তালা ও জানালা বন্ধ ছিল সে ঘরগুলো দেখা হল না। তবে বাড়ির ভিতর কোথায় সিঁড়ি আছে, কোথায় বারান্দা আছে এসব আমার দেখা হয়ে গেল।

সমস্ত বাড়িখানার ম্লান চেহারা দেখে আবদুলের কথাই আমার বিশ্বাস হল। হিমতভাইয়ের অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। হয়তো এখনও কিছু সঞ্চিত অর্থ আছে। তাইতেই সব কোনোরকমে চলছে কিংবা ধারে সব চলছে।

আমি চুপি চুপি আমার ঘরে ফিরে এসে দুদিনের বাসি পোশাক ছেড়ে

স্যুটকেস থেকে বার করে নতুন পোশাক পরলুম। মাথায় হেয়ার ক্রীম লাগিয়ে বেশ করে চুল আঁচড়ালুম।

হাতে এখনও বেশ কিছু পয়সা আছে। হিমতভাই যে একশটাকা দিয়েছিল তা থেকে মাত্র গোটা তিরিশ টাকা খরচ হয়েছে। নিজস্ব কিছু অর্থ ছিল, জয়ন্তর কাছ থেকে পাওনা কমিশন এখনও আদায় করা হয় নি। সেটা এখন আদায় করে নিয়ে আসা যাক। তাছাড়া জয়ন্ত ত বরোদারই লোক এবং একদা এবং তখনও সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত। অতএব হিমতভাই ও চন্দ্রার কিছু খবর দিতে পারে।

ঘড়ি দেখলুম। এখনও অনেক সময় আছে। ঘড়িটা পুরনো হয়ে গেছে। সময় খারাপ পড়লেও হিমতভাইয়ের নিশ্চয় এখনও একাধিক রিস্টওয়াচ আছে, একখানা চেয়ে নেবো।

আমাকে দেখেই ত জয়ন্তভাই ক্ষেপে উঠল। কি হে তোমার দেখা নেই কেন? আর আজ এলে এত বেলায়? সকাল থেকে কাপাস ম্যাচ কোম্পানি তোমাকে তিনবার ফোন করল, ওদের কি সিনেমা স্লাইড হবে. নাও বেরিয়ে পড়।

আমার কমিশনের টাকাটা হিসেব করেছ? টাকাটা দিয়ে দাও দিকি, আমার দরকার আছে।

বেশ ত তুমি কাপাস ম্যাচ থেকে ঘুরে এস. দিচ্ছি, এত দেরি করলে কেন? কোথায় ছিলে?

আমি ভাই তোমার সঙ্গে আর কাজ করব না, আমি একটা বড় মাছ গেঁথেছি, ভাল একটা চাকরি পেয়েছি, হাজার টাকা মাইনে, প্লাস খাওয়া থাকা ফ্রি।

ও তাই তোমার পোশাকে এত সাজগোজ! আমার আপাদমস্তক জয়ন্ত একবার দেখে নিল, তারপর আমাকে বলল, কবে খাওয়াচ্ছ অসিত?

এখনি খাওয়াতে পারি। একটা চুমো খেতে কোন খরচ নেই।

অসভ্য কোথাকার। তা কি ব্যাপার বলত অসিত? রাতারাতি কি ঘটল?

জয়ন্তর ছোট অফিস। কয়েকজন সাব-এজেন্ট মারফত সে তার ব্যবসা

চালায়। আয় যে খুব বেশি তা নয়, তবে অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল। নিজস্ব একখানা গাড়িও আছে। একদা বড় কোম্পানিতে চাকরি করেছে, শহরে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে, অনেক খবর রাখে, ব্যবসায়ী মহলেও সুপরিচিত। ও হয়তো একদিন বড় হবে।

বিজ্ঞাপনের ব্যবসা ছাড়া ওর আর একটা গোপন ব্যবসা আছে। সেটা হল ধনী ব্যক্তিদের জন্যে এবং হোটেলে কলগার্ল সাপ্লাই করা। এজন্যে সে পুলিসের হাতে দুবার ধরাও পড়েছিল, অনেক কষ্টে বেরিয়ে এলেও ও ব্যবসা ছাড়তে পারে নি। পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেই আছে।

আমার নিজের বিশ্বাস চন্দ্রা একদা কলগার্ল ছিল এবং এখনও সে পুরনো বৃত্তি ছাড়তে পারে নি। এখনও হয়তো হিমতভাইকে লুকিয়ে রাত্রে বা দিনে বাইরে যায় তাই ওর আলাদা বেডরুম, আলাদা সিঁড়ি।

আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে আর নিজে একটা ধরিয়ে জয়ন্ত আমাকে বলল, এবার বল ত তোমার কাতলা মাছটি কে?

আমি জয়ন্তকে সব কিছু বললুম। ক্লাবের সামনে অ্যাকসিডেণ্ট থেকে বাঁচানো থেকে শুরু করে কিছুই গোপন করলুম না।

কি নাম বললে? হিমতভাই? ইউ আর এ ফুল। ও ত শেষ হয়ে গেছে, মাসখানেক পরেই ও দেউলে খাতায় নাম লেখাবো, নয়তো সুইসাইড করবে, ও ত একটা অ্যালকোহলিক। মদ খেয়েও ওর আর নেশা হয় না। ও শেষ হয়ে গেছে, লোকটা এমন ছিল না। ওর বৌ চন্দ্রা ওকে শেষ করেছে, ব্যবসায়ে একটা রং ইনভেস্টমেণ্ট বা স্পেকুলশন করে একটা ভুল করে ফেলেছিল বটে, কিন্তু তা থেকে ও কাটিয়ে উঠতে পারত যদি না একটা কাল কেউটে ওর বৌ হত। শালী ত আগে একবার কাকে বিয়ে করেছিল। তারপর তাকে বম্বের এক হোটেলের জানালা থেকে নিচে ফেলে দিয়েছল। সে এক কেলেংকারি। তুমি আর গ্রীনপার্কে ফিরে যেওনা, যা করছিলে তাই কর। আমি না হয় তোমার কমিশন কিছু বাড়িয়ে দেবো।

আরে না না, আমি শেষ না দেখে ছাড়ছি না। আমার একটা রোখ চেপেছে। হিমতভাই যদি মরে তাহলে আমি চন্দ্রাকে জব্দ করব, ওকে আমি দখল করব। আমি ওকে নাচাব।

ওসব আইডিয়া ছাড়। তোমার সর্বনাশ হবে। বেশ ত তুমি হিমতভাইয়ের চাকরি করছ কর কিন্তু তোমার হাতে ত এখন প্রচুর সময়। কর্তাকে শুধু দুবার আনা নেওয়া। বাকি সময়টা আমার যেমন কাজ করছিলে তেমনি কাজ করবে।

সে আমি তোমাকে পরে বলব।

দেখো ভাই তুমি আমার পুরনো বন্ধু। তোমার কিছু খারাপ হোক তা আমি চাই না, দেখে শুনে পা ফেল।

দরকার হলেই তোমার সঙ্গে পরামর্শ করব, আমি এখন যাই, কর্তাকে আনতে যাবার সময় হল।

ফেরার পথে আমার মাথায় ঢুকল, বম্বেতে চন্দ্রা কাকে হোটেলের জানালা থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিল ?

জয়ন্তীভাইয়ের অফিস থেকে বেরিয়ে অনুভব করলুম বেশ খিদে পেয়েছে। বরোদা শহরে খাবার দোকানের অভাব নেই। সব দোকান বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং নানারকম খাবারে শো-কেস ভর্তি। একটা দোকানে ঢুকে কিছু বরফি ও একগ্লাস দুধের অর্ডার দিলুম। দুধে মৃদু এলাচ গন্ধ, বোধহয়, দুধের ত্রুটি ঢাকবার জন্যে এলাচ গন্ধ করা হয়। তবে গুজরাটবাসীরা এলাচ গন্ধ পছন্দ করে সেজন্যে এখানে এলাচ গন্ধ হরলিকস পাওয়া যায়।

খাবারের দোকান থেকে বেরিয়ে পঁচাত্তর পয়সা দিয়ে এক খিলি পান কিনে চিবোতে চিবোতে বাসস্ট্যাণ্ডে এলুম। বাসস্ট্যাণ্ডটি ঠিক রেলওয়ে স্টেশনের মতো। বাসের টাইমটেবল লেখা আছে দেওয়ালভর্তি, কোন গেট থেকে কটার সময় কোন বাস ছাড়বে তাও লেখা আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় গুজরাটী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতে তিনি টাইমটেবল থেকে বলে দিলেন ১৫ নম্বর গেটে যান আর পাঁচ মিনিট পরে রনোলি যাবার বাস ছাড়বে, সেই বাস ছানি যাবে। ১৫ নম্বর গেটটা তিনি আমাকে দেখিয়েও দিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

প্রায় ঠিক সময়ে বাস এল। বাসের যাত্রীরা নামলেন কিন্তু নতুন যাত্রীদের বাসে ওঠবার জন্যে সে কি প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি, বৃদ্ধ শিশু বা নারীদের

অগ্রাহ্য করে জোর জার মুল্লুক তার নীতি অবলম্বন করে সকলে বাসে উঠতে ব্যস্ত। ভাবটা এইরকম যে এই বাস মিস করলে জীবন বুঝি ব্যর্থ হয়ে যাবে। বাসে যথেষ্ট সিট থাকলেও এইভাবেই নাকি এখানে বাসে উঠতে হয়। সারা গুজরাটেই এই ব্যবস্থা চালু। বাসের বোর্ডে রুট নম্বর নেই, নেই কোনো ইনস্পেক্টর, টিকিটও গুজরাটী ভাষায়।

পরে একজন গুজরাটী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম যে গুজরাটী ভাষার জন্যে বিদেশীদের অসুবিধে হয়। অন্ততঃ রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ব্যবহৃত হলে কিছু সুবিধা হয়। তিনি বলেছিলেন তোমার দরকার হলে তুমি ভাষা শিখে নাও।

বেলা তিনটের কিছু পরে গ্রীনপার্কে ফিরলুম। আমি গ্যারাজ থেকে রোলস বার করতে যেয়ে দেখি ম্যাডামের ক্যাডিলাক নেই। সেই যে তিনি লাঞ্চ করতে গেছেন আর ফেরেন নি, কোথায় কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছেন কে জানে?

আমি গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করলুম। আমার অনেক দিনের সাধ একখানা রোলস চালাব। পরের গাড়ি হলেও সে সাধ আমার পূর্ণ হয়েছে। রোলসটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। গাড়িখানা আপাততঃ ঝাড়পোঁছ করবার দরকার ছিল না, তবুও ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

নর্মদা ভ্যালি ইণ্ডাস্ট্রিজের অফিসে চারটের কিছু আগে পৌঁছলুম। সাহেব বলেছেন তাঁকে ঠিক চারটের সময় ডাকতে। আশেপাশে আরও অনেক গাড়ি রয়েছে, কিছু খোলা জায়গায় কিছু একটা লম্বা শেডের মধ্যে। কিন্তু একখানা জাপানী টয়োটা ছাড়া বিদেশী গাড়ি আর একখানাও চোখে পড়ল না।

চারটে বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি তখন আমি রিসেপশনে গেলুম। পাশাপাশি তিনজন- সুন্দরী যুবতী, তিনজনের তিনরকম সাজ, একজনের সালোয়ার কামিজ, একজনের শাড়ি আর একজনের হাওয়াই শার্ট ও বেলবটম।

প্রথমে ছিল সালোয়ার কামিজ। তাকেই বললুম বহেনজী দয়া করে একবার মিঃ হিমতভাই শাকে ইন্টারকমে বলবেন যে তাঁর গাড়ি এসেছে।

সালোয়ার কামিজ ভুরু কুঁচকে বলল, কে হিমতভাই ? অমন অনেক কেরানী এখানে কাজ করে। কি গাড়ি ? সাইকেল ?

আমি অবাক হয়ে বলি সে কি ? আপনাদের কোম্পানির একজন ডিরেকটর, আর তার নামই জানেন না ?

সালোয়ার কামিজ এবং বাকি দুজন যুবতী হেসে উঠল। প্রথম যুবতী বলল, ও নামে এই অফিসে কোনো ডিরেকটর নেই

এরা কি বলে ? লোকটার না হয় সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই বলে তার অস্তিত্বই এই অফিসে কেউ স্বীকার করে না। নর্মদা ভ্যালি ইণ্ডাস্ট্রিতে কোনোদিন হিমতভাই শা নামে কোনো বেয়ারা পিওন বা কেরানী থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু হিমতভাই শা নামে এমন কেউ ছিল না যে এই এত বড় একটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা, যে কোম্পানির ভারতে বিভিন্ন শহরে এবং ভারতের বাইরে কেনিয়া, উগাণ্ডা এবং ইথিওপিয়াতে শাখা অফিস আছে।

জানলেও তারা সাহেবকে ডেকে দেবে না। তখন আমি নিজেই লিফ্‌ট করে ওপরে উঠে হিমতভাইয়ের চেম্বারের দরজায় নক করলুম। কোন সাড়া পেলুম না। তখন দরজা ঠেললুম। দরজা খুলে গেল। দেখলুম হিমতভাই চেয়ারে নিশ্চল হয়ে একটা পুতুলের মতো বসে আছেন। চোখ চেয়ে আছেন কিন্তু সে চোখে কোনো দৃষ্টি নেই। তিনি জীবিত কি মৃত বোঝা যাচ্ছে না।

কব্জি টিপে ধরলুম। মরেন নি, বেঁচেই আছেন। আমি বললুম, চারটে বেজেছে স্যার, বাড়ি চলুন।

আমি বোধহয় ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্তির সঙ্গে কথা বললুম, কোনো সাড়া নেই, এমনকি চোখের পলকটিও পড়ল না। এই অবস্থাকে বুঝি বলে প্যারালিটিক ড্রাংক। অ্যালকোহলের প্রভাবে সমস্ত স্নায়ু ও মস্তিষ্কের সব কোষ বুঝি অসাড় অনড় হয়ে গেছে।

আমি চেম্বারের দরজাটা বন্ধ করে দিলুম। কৌতূহলী ব্যক্তিরা তাঁর অস্তিত্ব হয়তো স্বীকার করবে না, কিন্তু দরজা থেকে বা ঘরে ঢুকে তামাশা করতে ছাড়বে না।

আমি একটা উপন্যাসে পড়েছিলুম যে সব মদ্যপ অ্যালকোহলিজমে

ভোগে তাদের এই পক্ষাঘাত-প্রায় অবস্থা কাটতে কিছু সময় লাগে। এই সময়টা কি করি।

ফাইল ক্যাবিনেটটা খুলে দেখাই যাক। প্রথম ক্যাবিনেটটাতে লাল সবুজ নীল ইত্যাদি রঙের চামড়ায় বাঁধানো ক্লিপ লাগানো কয়েকটা বড় ফোলডার রয়েছে। ফোলডারগুলোর ওপরে সোনার জলে লেখা রয়েছে, ফর মিঃ এইচ শা'স ওপিনিয়ন, ফর দি ইমিজিয়েট অ্যাটেনশন অফ মিঃ এইচ শা, রেফার টু মিঃ এইচ শা ইত্যাদি।

বেশ বোঝা গেল এককালে এই অফিস হিমতভাই শা চালাতেন। ফোলডারগুলি যথাস্থানে রাখতে যেয়ে একখানা খাম চোখে পড়ল।

মোটা খাম, ওপরে নর্মদা ভ্যালি ইণ্ডাস্ট্রির নাম ঠিকানা ছাপা। খামটা বেশ পুরনো হয়েছে। ওপরে টাইপ করে নাম লেখা রয়েছে ঈশ্বরভাই শোলাংকি, রাওপুরা, বরোদা। খামটা বেশ মোটা. মুখ বন্ধ।

খামখানা অনেকদিন থেকে এই অবস্থায় আছে। হিমতভাইয়ের মতোই এর অস্তিত্বই হয়তো সকলে ভুলে গেছে। ভীষণ কৌতূহল হল। খুলে দেখা যাক. কে এই ঈশ্বরভাই? খামের ভেতর কি আছে?

একবার হিমতভাইয়ের দিকে চেয়ে দেখলুম তিনি একইভাবে বসে রয়েছেন। খামখানা আস্তে আস্তে খুলে ফেললুম, ভেতরে রয়েছে পাঁচখানা একশ' টাকার নোট আর ছোট একটা স্লিপ, ফর সারভিস রেণ্ডারড বাই ঈশ্বরভাই। ঈশ্বরভাই কোনো সময়ে কোনো এমন কাজ করেছিল যার দ্বারা কোম্পানি উপকৃত হয়ে তাকে এই অর্থ বখশিস বা ঘুষ বাবদ দেবার মনস্থ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বরভাই কোনোদিন সেই টাকা দাবি করতে আসে-নি। নোটগুলো প্রায়, দশ বছরের পুরনো, বর্তমানে অমন ডিজাইনের নোট চালু নেই। আমি আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে নোটগুলি পকেটে রাখলুম। হিমতভাই আমাকে যদি একটা রিস্টওয়াচ না দেয় তাহলে এই টাকায় একটা রিস্টওয়াচ কেনা যাবে।

পরের ড্রয়ারটা খুললুম। ব্রাউন পেপার দিয়ে একটা লম্বা খাম মোড়া রয়েছে। মোড়কটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

হিমতভাইয়ের দিকে আর একবার চেয়ে মোড়কটা খুলে ফেললুম। ব্রাউন পেপারের মোড়ক খুলতেই বিদেশী একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানির

ইনসিওরেন্স কভার। সেই ইনসিওরেন্স কোম্পানি ভারতে বর্তমানে তাদের কাজকর্ম বন্ধ করলেও বিদেশী একটি বৃহৎ ব্যাংকের ওপর পাওনা মেটাবার ভার দিয়ে গেছে।

খাম থেকে ইনসিওরেন্স পলিসিখানা বার করলুম। দশ লক্ষ টাকার পলিসি। হিম্মতভাইয়ের যেভাবে মৃত্যু হোক, স্বাভাবিক দুর্ঘটনা এমন কি আত্মহত্যা করলেও চন্দ্রাবতী শা বোনাস সমেত সেই দশ লক্ষ টাকা পাবে।

আমি পলিসিটা যথাস্থানে রেখে দিলুম। যে কোনো কারণে হোক হিম্মতভাই পলিসিটা তখনও অফিসে রেখেছে। ইনসিওরেন্স পলিসির কথা চন্দ্রা নিশ্চয় জানে এবং সেইজন্যেই কি সে চায় যে তার স্বামীর শীঘ্র মৃত্যু হোক।

পরের ড্রয়ার খুললুম। খবরের কাগজের ক্লিপিং বসানো কিছু ফাইল রয়েছে। হিম্মতভাই সম্পর্কে যেসব খবর কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তারই ক্লিপিং বসানো রয়েছে।

পিছনে একটু আওয়াজ শুনতেই আমি তাড়াতাড়ি ফাইলটা ড্রয়ারে রেখে ড্রয়ার বন্ধ করে দিলুম। ফাইল ক্যাবিনেটগুলোর ড্রয়ারের নিচে ছোট ছোট প্লাস্টিকের চাকা লাগানো আছে, ড্রয়ার খোলা বা বন্ধ করার সময় কোনো আওয়াজ হয় না।

ফাইল ক্যাবিনেট বন্ধ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম হিম্মতভাই হাত দুটো টেবিলের ওপর রাখলেন, তারপর ভুরু কুঁচকে আমাকে কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন। চিনতে পেরে বললেন—অসিত তুমি এসে গেছ? চারটে বেজেছে? আজ অনেক কাজ ছিল। লাঞ্চ করবারও সময় পাইনি।

আমি একটু অবাক হলুম, এত তাড়াতাড়ি কি করে জ্ঞান ফিরে আসতে পারে? আমি বললুম, এখন স্যার চারটে বেজে পনেরো মিনিট, বাড়ি যাবেন ত?

তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, পা টলছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

হিম্মতভাই হঠাৎ হেসে উঠলেন। কি হল? তিনি নিজেই বললেন, একটা কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমি স্টুডেন্ট। একদিন রাত্রে কয়েকজন বন্ধু মিলে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ দেখি কি, একটা

মাতাল একটা পা ফুটপাথে আর একটা পা রাস্তায় রেখে টলতে টলতে হেঁটে চলেছে। আমাদের মধ্যে কে একজন, বোধহয় ভিকি, এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে ফুটপাথে তুলে দিল। লোকটা ফুটপাথে কয়েক পা হেঁটে মাথার টুপি তুলে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের বলল, থ্যাংক ইউ ব্রাদার, আমি ভাবছিলুম আমি বুঝি খোঁড়া হয়ে গিয়েছি। আমিও এখন দাঁড়াবার আগে মনে করছিলুম আমিও বুঝি খোঁড়া হয়ে গিয়েছি।

হিমতভাইয়ের কথা শুনে আমিও হেসে উঠলুম।

এবার বাড়ি চলুন স্যার।

কি করে যাব? হাঁটতে পারছি না ত?

চলুন আপনাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

হিমতভাই বেশ লম্বা চওড়া, দুশো পাউণ্ড ওজন হবে। আমি নিজে রোগাপটকা নই। হিমতভাইকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলুম। পথে এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে হিমতভাই আমাকে কিছু খাবার কিনে নিতে বললেন। তাঁর আশংকা বউ তাঁর জন্যে খাবারের কোনো ব্যবস্থাই রাখে নি।

খাবারের প্যাকেটটা হিমতভাই নিজের কোলে নিয়ে এমনভাবে বসলেন যেন এটি খোয়া গেলে অনেক ক্ষতি হবে। তিনি আমার পাশেই বসেছিলেন। কয়েক মিনিট পরেই দেখি তাঁর তুষ্ণীভাব, অজ্ঞান হয়ে গেছেন যেন, বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ রহিত।

একটু আগেই আমি দশ লক্ষ টাকার ইনসিওরেন্স পলিসি দেখে এসেছি, এখন আমার খেয়াল হল চন্দ্রাবতী শা স্বামীর জন্যে কেন ড্রাইভার রাখতে দেন না। কোনো দিন গাড়ি চালাতে চালাতে স্বামী একটা দুর্ঘটনা ঘটালে মৃত্যু হবে, তখন ঐ দশ লাখ টাকা সহজেই পাওয়া যাবে। উত্তরাধিকারসূত্রে আরও কিছু পাওয়া যাবে হয় তো।

শহর থেকে ছানিতে গ্রীন পার্কে আসতে বেশি সময় লাগে না। এক জায়গায় রাস্তা মেরামতের জন্যে সেদিন কিছু দেরি হল, তবুও এমন কিছু দেরি নয়।

এ অঞ্চলে বিকেলটা বেশ বড়। যখন বাড়ি পৌঁছলুম তখন চারদিকে শেষ রোদ ঝলমল করছিল। গেট থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত রাস্তাটা আজ

বেশ পরিষ্কার দেখলুম। শুকনো পাতা বা আবর্জনা পড়ে নেই। বাড়ির গৃহিনী বোধহয় লোক ডাকিয়ে বাগান পরিষ্কার করিয়েছেন।

বাড়ির দরজার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আমি স্যার-স্যার বলে হিমতভাইকে কয়েকবার ডাকলুম কিন্তু কোনো সাড়া নেই। অফিসে যেরকম দেখেছিলুম সেইরকম অবস্থা।

ওর এখন জ্ঞান হবে না, চন্দ্রাবতীর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলুম। পরনে পেটিকোট বা চানিয়া এবং গায়ে ছোট হাত কাটা ব্লাউস, পায়ে চপ্পল, মাথায় একটা রুমাল বাঁধা। হাতে গাছকাটা কাঁচি নিয়ে তিনি গোলাপ গাছের শুকনো ডাল কাটছিলেন।

আমাকে বললেন, তুমি ওকে ধরে তুলে নিয়ে যাও। রাত্রি নটার আগে ওর জ্ঞান ফিরছে না। আমি ঢের দেখেছি।

সেদিন নগদ পাঁচশ টাকা লাভ হয়েছে। মনটা বেশ ফুর্তিতে আছে। আমি শার্টটা খুলে হিমতভাইকে আস্তে আস্তে আমার ঘাড়ে তুলে নিলুম। দমকলের কর্মীরা বা সমুদ্রের ধারে লাইফগার্ডরা অজ্ঞান ব্যক্তিকে যেভাবে কাঁধে তুলে নেয় সেইভাবে। আমি দুর্বল নই, এককালে কুস্তি, একসারসাইজ, দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলো ত করেছি, এখনও সময় পেলেই সাঁতার কাটি, অতএব হিমতভাইয়ের দুশো পাউণ্ড বা কিছু বেশি ওজন হলেও তাঁকে কাঁধে তুলে ওপরে নিয়ে যেতে আমার কষ্ট হল না।

হিমতভাইয়ের ঘরে বেশ বড় একটা শোফা ছিল। তাতে একজন মানুষ অনায়াসে আরামে শুতে পারে। হিমতভাইকে আমি সেই সোফায় শুইয়ে তার জুতো মোজা এবং সমস্ত পোশাক খুলে একেবারে উলঙ্গ করে দিলুম।

পোশাকগুলো ময়লা হয়েছিল। লণ্ড্রিতে দেবার জন্যে সয়েলড় লিনেন ক্যাবিনেটে রেখে দিলুম। তারপর বাথরুমে গিয়ে তোয়ালে সাবান ও এক গামলা গরম জল এনে হিমতভাইকে বেশ করে পরিষ্কার করে দিলুম।

বাথরুমে তোয়ালে ও গামলা রেখে এসে ড্রেসিং টেবিল থেকে পাউডারের কৌটো নিয়ে, হিমতভাইয়ের গায়ে যখন পাউডার বোলাচ্ছি ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকলেন চন্দ্রাবতী।

তাকে দেখেই ত আমার মাথা ঘুরে গেল, কারণ গায়ে সেই ছোট জামাটুকু থাকলেও পরনে সেই চানিয়া নেই, রয়েছে শুধু একটি ইজের।

তিনি নিজে কিন্তু বিরত হলেন না। বিরক্ত হয়েই বললেন। তোমাকে এসব করতে কে বললে? ও কি? আমার দিকে হাঁ করে দেখছ কি? মেয়েমানুষ কখনও দেখনি কি?

আমি কোনো জবাব দিলুম না। চন্দ্রাবতী বললেন, এবার বুঝলে তো তোমাকে কি কাজ করতে হবে। হিমতভাই খাটিয়ে খাটিয়ে তোমার দম বার করে দেবে। এ কাজ কেউ পছন্দ করে নি, আমিও চাই না তুমি থাক। তুমি এখনি বিদেয় হও।

তবুও আমি কোনো জবাব দিলুম না। তখন তিনি বললেন, দুশো টাকা দিচ্ছি নাও চলে যাও।

বহেনজী আমি চলে যাব নিশ্চয় কিন্তু বাবুজী না বললে আমি আপনার কথায় যাব না।

আমি লক্ষ্য করলুম চন্দ্রাবতীর সমস্ত শুভ্র দেহটা ক্রোধে লাল হয়ে গেল। —তবে মর, বলতে বলতে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন। রাগবার তো যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমি থাকলে হিমতভাই সহজে মরবে না বা মারাও যাবে না।

হিমতভাইয়ের স্লিপিংস্যুটের জন্য আমি ঘরে একটা চেস্ট অফ ড্রয়ার খুললুম। ওপরের ড্রয়ারে নানারকম টুকিটাকি সামগ্রী রয়েছে যেমন তিন চারটে ঘড়ি, কয়েকটা পকেট রেডিও, আট দশটা ফাউনটেন পেন, পকেট অ্যাডিং মেসিন ইত্যাদি, শেভিং সেট ইত্যাদি।

একটা ঘড়ি ও একটা জাপানী পকেট রেডিও আমি ত আগে প্যান্টের পকেটে পুরলুম। তারপর সে ড্রয়ার বন্ধ করতে পরের ড্রয়ারে দেখলুম থাকে থাকে কিছু পোশাক সাজানো রয়েছে। সে ড্রয়ারে স্লিপিং স্যুট নেই। পরের ড্রয়ারটা খুলতেই সিল্কের পাজামা স্যুট পাওয়া গেল।

হিমতভাইকে পাজামা স্যুট পরিয়ে বিছানায় তুলে শুইয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।

নিজের ঘরে ফিরে এসে জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে এলুম। কফির জল চাপালুম। হিমতভাই প্রচুর গুজরাটী খাবার কিনেছিল, আমি তাই থেকে একটা ঠোঙায় করে কিছু খাবার তুলে নিয়েছিলুম। কফির সঙ্গে

সেগুলো সদ্ব্যবহার করা গেল। ক্ষিধেও পেয়েছিল।

চন্দ্রাবতী অমন আশ্চর্য সুন্দরী একটা মেয়ে। অভিনয় করতে, নাচতে কিংবা গান গাইতে জানে কি না জানি না। তবে ও যদি কখনও বম্বেতে স্টুডিওয় যায়, তাহলে তো ওকে লুফে নেবে বলে আমার বিশ্বাস সেকালের বৈজয়ন্তীমালা, বা বিন্দু বা হেলেন ত ওর কাছে কিছুই নয়।

কিন্তু এমন সুন্দরী মেয়ে, সে এমন কুটিল কেন? প্রতিমুহূর্তে সে তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করছে। দশ লাখ টাকা কম নয়। হিমতভাই মারা গেলে আরও কিছু সম্পত্তি হয় তো পাবে।

ড্রয়ার খুলে যে ঘড়িটা আর পকেট রেডিওটা এনেছিলুম এবার সেদুটো দেখতে লাগলুম। ঘড়িটা বন্ধ ছিল। দম দিতেই চলতে লাগল। স্টেনলেস স্টীলের অ্যামেরিকান ঘড়ি, দামী নয়। বোধহয়, আশি নব্বুই ডলার হবে। রেডিওটাও বাজতে লাগল। বেশ সুন্দর আওয়াজ, কয়েকটা স্টেশনও স্পষ্ট আসে। বড়লোকের সঙ্গে থাকলে এমন আরও কত কি পাওয়া যাবে।

আমি নিজেও লোকটা ভাল নই। ছোটখাটো চুরিচামারি, অসৎ কাজ এবং কয়েকজন মেয়ের সর্বনাশও করেছি। মেয়েরা নিজেরাই আমার কাছে এসেছে, আমাকে যেতে হয়নি এবং সকলেই বিবাহিত। সে কাহিনী স্বতন্ত্র।

এইসব ভাবতে ভাবতে আমি অনুভব করলুম আমি চন্দ্রাকে হিংসে করছি। তাকে আমি হিংসে করছি কেন? সে আমার ঠিক ক্ষতি করছে না। যদিও আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে। তা বলে আমি তাকে হিংসে করতে গেলুম কেন? বিনা পরিশ্রমে দশ লাখ পেয়ে যাবে বলে? স্বামী যাতে তাড়াতাড়ি মরে এজন্যে চন্দ্রাই তাকে মদ ধরিয়েছে। মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে যাতে একটা অ্যাকসিডেন্ট করে মরে এই হল চন্দ্রার উদ্দেশ্য।

বিষ খাইয়েও তো হিমতভাইকে মারতে পারে কিন্তু তাতে অনেক ঝুঁকি আছে। কোথাও না কোথাও প্রমাণ থেকে যেতে পারে। আজকাল ফোরেনসিক ল্যাবরেটরির লোকেরা অনেক অপরাধ সহজে ধরে ফেলে। এক মৃত মহিলার ব্লাউসে ছোট্ট একটা সুতো লেগেছিল সেই সুতো পরীক্ষা করবার একঘণ্টার মধ্যে খুনী ধরা পড়েছিল।

আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছে। চন্দ্রা আমাকে এই বাড়ি থেকে তাড়াতে চায় কারণ তার কার্যসিদ্ধিতে আমি বাধা হতে পারি। আমাকে এই বাড়ি থেকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যটা যে কি তা আমি জানি কিন্তু চন্দ্রা জানে না। আমি যতদিন হিমতভাইয়ের গাড়ি চালাব ততদিন হিমতভাইয়ের মোটর অ্যাকসিডেণ্ট ঘটা এবং সেজন্য তাঁর মৃত্যু হওয়া সুদূর পরাহত।

হঠাৎ আমার জয়ন্তীভাইয়ের কথা মনে পড়ল। জয়ন্তীভাই আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিল চন্দ্রাদেবী সাংঘাতিক মেয়ে। ও একটা লোককে বিয়ে করে কয়েক মাসের মধ্যে তাকে জানালা দিয়ে সাততলা থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিল।

হিন্দুঘরের একজন বউ বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যে স্বেচ্ছায় কেন বিধবা হতে যাবে? চন্দ্রাবতীই যে তার সেই স্বামীকে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল একথা পুলিস প্রমাণ করতে পারে নি। প্রমাণ করতে না পারলেও ঘটনা মিথ্যে হয়ে যায় না। সেই স্বামীও কি ইনসিওর করেছিল? চন্দ্রাবতী কি সে বাবত টাকা পেয়েছিল?

ঘটনাটা বরোদাতে ঘটে নি, ঘটেছিল বম্বেতে। হিমতভাইয়ের সঙ্গে চন্দ্রাবতীর নাকি বম্বেতেই আলাপ হয়েছিল এবং সেখানেই বিয়ে হয়েছিল। আমি বম্বে বা বরোদার ছেলে নই, এদের আচার ব্যবহার ও ভাষা সম্বন্ধেও কিছুই জানি না। হিমতভাই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি, তার বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। ঐ তো ড্রয়ারে একটা কাগজের ক্লিপিং বসানো ফাইল পেয়েছি, তাতেই তো কত কি লেখা আছে? কিন্তু চন্দ্রাবতী?

ও যখন বাড়ি থাকবে না সেই সময় একদিন ওর শোবার ঘরে ঢুকে ওর বাক্সপত্তর ঘেঁটে দেখতে হবে ওকে ব্ল্যাকমেল করার মতো লাভলেটার বা কোনো ফটো পাওয়া যায় কি না।

তার আগে তো আমি একটা কাজ করতে পারি। জয়ন্তীভাই তো একদা, একদা কেন এখনও হয়তো কলগার্ল সাপ্লাই করে। চন্দ্রাবতী নিশ্চয় একদা কলগার্ল ছিল এবং এখনও ঐ পেশা ছাড়েনি, ওর বিষয় কি জয়ন্ত কিছুই জানে না? হতেই পারে না। দরকার হয় জয়ন্তর জন্যে ব্ল্যাক-মার্কেট থেকে, ব্ল্যাকমার্কেট থেকে কেন, হিমতভাইয়ের কাবার্ডেই তো

কতরকম বিলিতি মদ আছে। তারই এক বোতল জয়ন্তকে না হয় ঘুষ দেবো। চন্দ্রাবতীর যদি কোনো সিক্রেট জানতে পারি।

জয়ন্তীভাই যদি মোটা টাকা চায়? তাহলে কি প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগাব? কিন্তু এখানে ত কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আমি চিনি না। সে না আবার উলটে আমাকে ব্ল্যাকমেল করে?

এখানে এই বরোদা শহরে আমার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি বলতে জয়ন্তীভাই। যা কিছু করবার তার সঙ্গেই পরামর্শ করে করব। আমি যদি শেষ পর্যন্ত চন্দ্রাকে ব্ল্যাকমেল করে মোটা টাকা আদায় করতে পারি, তাহলে না হয় কিছু শেয়ার জয়ন্তকেও দেওয়া যাবে। চাই কি দশ লাখের অর্ধেকও জুটে যেতে পারে।

ছেঁড়াকাথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্ন দেখার মতো আণ্ডারওয়্যার পরে বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আকাশকুসুম ভাবতে লাগলুম। আমেরিকায় গিয়ে আমার বসবাস করার দীর্ঘদিনের ইচ্ছে। মোটা থোক কিছু টাকা পেলে দেশ থেকে কেটে পড়া যাবে।

একটা দ্রুত উপায় ত আছে। খুন। হিমতভাইকে খুন করা খুব সহজ। পুলিসকাহিনী পড়ে যা জেনেছি তাতে বুঝেছি যে খুন করা যত সহজ ধরা পড়াও তত সহজ।

হিমতভাই খুন হলে পুলিস প্রথমে সন্দেহ করবে তার স্ত্রী চন্দ্রাবতীকে। কারণ চন্দ্রাবতীর একটা মোটিভ আছে। স্বামী মরলে ইনসিওরেন্সের দশ লক্ষ টাকা সে পাবে।

পুলিস ইনকুয়ারি করে জানতে পারবে যে চন্দ্রা নিজে তার স্বামীকে খুন করে নি, কারও সাহায্য নিয়েছে। সাহায্য নেবার মতো কাছের একজনকে সন্দেহ করা স্বাভাবিক। সে কাছের একজন আমি। আমাকে পুলিস সন্দেহ করবে।

পুলিস ছাড়া আছে ইনসিওরেন্স কোম্পানি। তারাও কি সহজে ছাড়বে নাকি? তাদেরও ডিটেকটিভ আছে। মানুষ মরলেই তারা টাকা দিয়ে দেবে নাকি?

চন্দ্রার প্ল্যানটা কিন্তু ফুলপ্রুফ। স্বামীকে সে খুন করতে যাচ্ছে কিন্তু নিজে হাতে তো নয়ই এমন কি কারও সহায়তায়ও নয়। একে বলা যেতে

পারে রিমোট কন্ট্রোল মার্ডার, এখানে সুইচ টিপলুম ওখানে আলো জ্বলল। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালালে বা স্রেফ রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সে মাতাল মরতেই পারে এবং শর্ত অনুসারে ইনসিওরেন্সের টাকাও পাওয়া যেতে পারে তবে ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়ম ঠিক ঠিক জমা পড়ে থাকা চাই।

চন্দ্রাবতী ত চাইছে হিমতভাই তাড়াতাড়ি মরুক। আমি কি সেই কাজটা এগিয়ে দিতে পারি না? অবশ্যই বিনা স্বার্থে নয়।

সেই যে লোকটা যাকে চন্দ্রা জানালা দিয়ে ফেলে ছিল অথচ চন্দ্রার কোনো শাস্তি হল না সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিলে হয়। আমিই না হয় চন্দ্রার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সাক্ষী রেখে একদিন গ্রীন পার্ক থেকে ছুটি নিয়ে কোথাও গেলুম এবং এক সময়ে লুকিয়ে ফিরে এসে হিমত-ভাইকে তুলে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দিলুম। তাহলে কেমন হয়? চন্দ্রা কি রাজি হবে?

জয়ন্তীভাইয়ের সঙ্গে একটু কথা বলা যাক। সে চন্দ্রার অতীত কাহিনী কিছু বলতে পারে কিনা। জানতে হবে চন্দ্রা তার প্রাক্তন স্বামীকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খুন করে ইনসিওরেন্সের টাকা পেল কি না। জয়ন্তীভাই খবরের কাগজের লাইনের লোক। একদা কলগার্ল নিয়ে ব্যবসা করেছে। এখনও করে বোধ হয়। ওর সেক্রেটারি প্রীতিই হয়তো বান্ধবী যোগাড় করে আনে।

হিমতভাইয়ের এলগিন ঘড়িটা হাতে পরাই ছিল। কব্জি ঘুরিয়ে দেখলুম সাতটা বেজেছে। বরোদায় সবে সন্ধ্যা হচ্ছে জয়ন্তর অফিস হয়ত এখনও খোলা আছে তাছাড়া শুনেছি জয়ন্ত ঐ বাড়িতেই থাকে। হয়ত ওর অফিসের পিছনের ঘরখানায়।

জয়ন্তকে একবার টেলিফোন করে দেখা যাক সে আছে কিনা। তবে এখান থেকে নয়। জুতো আর হাওয়াই শার্ট পরে বেরিয়ে পড়লুম। এ বাড়ি থেকে ফোন করব না। কে জানে চন্দ্রা যদি কথাবার্তা শোনে।

কাছেই ছানি বাস স্ট্যাণ্ড। সেখানে একটা কাপড়ের দোকানে টেলিফোন আছে। ফোন করতে পুরো একটা টাকা নিল।

জয়ন্ত নিজেই ফোন ধরল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম: কিরে ব্যাটা এখনও অফিসে আছিস?

হঠাৎ অসময়ে কি দরকার। বড় কাস্টমেন্ট পেয়েছিস নাকি?

না তা পাইনি, তবে হয়তো তোর কিছু রোজগার হতে পারে, আর তোকে এক বোতল অরিজিন্যাল হোয়াইট হর্স বা ব্ল্যাক হোয়াইট খাওয়াতে পারি

বেশ চলে আয়, জয়ন্ত বলল।

প্রীতি আছে? ওকে ছুটি দিয়ে দে।

কিন্তু আমার যে একটা ছুঁড়ির সঙ্গে ডিনার খাওয়ার কথা আছে রে কাল আয় না।

না রে আজই দরকার। ছুঁড়ির সঙ্গে ডিনারটা না হয় কালই ঠিক কর। আমি তোকে হুইস্কির বোতলটা কালই পৌঁছে দোবো, তোদের পার্টি জমবে ভাল। ছুঁড়ি ড্রিংক করে ত?

স্মোক ত করে জানি তবে ড্রিংক হয়তো করে না।

ছুঁড়িটা কে?

আরে একটা হাইক্লাস মডেল। আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে, সুইম-স্যুট ম্যানুফ্যাকচার করে। তারজন্যে নিউজপেপার সিনেমা স্লাইড আর টি. ভি.-এর জন্যে ছবি চাই। ছুঁড়ি থাকে বম্বেতে তবে বরোদার মেয়ে, বোনের বিয়েতে এখানে এসেছে, খবর পেয়ে পাকড়াও করেছে। হাই রেট, তুই কিছু টাকা দিলে .....

আরে সে ব্যবস্থা হবে। আমি তাহলে নেক্সট বাসে তোর অফিসে যাচ্ছি।

নেক্সট বাস আসতে তখনও দেরি ছিল। ছানিতে বেশ গুঁড়ি মোটা বেঁটে খাটো গোলাকার একটা তেঁতুল গাছ আছে। সেই তেঁতুল তলায় একটা চায়ের স্টল আছে। চা খাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দেখি কি যে বেশ লম্বা চওড়া একজন যুবতী। স্লিভলেশ ব্যানলন আর জিন পরে চা খাচ্ছে। অতএব আমারও চা খেতে ইচ্ছে হল।

দশ মিনিটের মধ্যে রনোলি না ফার্টিলাইজারনগর কোথা থেকে বরোদার বাস এসে পড়ল। আমি উঠে পড়লুম। ভেবেছিলুম মেয়েটাও উঠবে কিন্তু সে উঠল না। সে দেখি একটা স্কুটারে স্টার্ট দিচ্ছে।

জয়ন্তীভাই তার ছোট অফিসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্রীতিকে ছুটি দিয়েছিল। প্রীতি তার হ্যাণ্ডব্যাগ গুছিয়ে আয়না দেখে মুখখানা একটু মেরামত করে নিচ্ছিল।

প্রীতি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আমি পকেট থেকে এক প্যাকেট ইম্পোর্টেড সিগারিলো বার করে ওর সামনে রেখে বললুম, ধরাও, ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটের বোতল কাল নিশ্চয় পাবে। আমার কর্তার ঘরে কাবার্ড ভর্তি নানারকম বিলিতি মাল আছে।

আমরা দুজনে দুটো সিগারিলো ধরালুম। জয়ন্তীভাই জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপারটা এত আর্জেন্ট কেন?

তুমি কি তোমার সেই মডেলের সঙ্গে ডিনার আজ ক্যানসেল করেছ?

এখনও করি নি। তোমার কথাগুলো শুনে যা করবার করব।

ডিনার ক্যানসেল করতে হবে না। তুমি বরঞ্চ আর আধঘণ্টা পিছিয়ে দাও, বল তো আমিও তোমার সঙ্গে ডিনারে যেতে পারি, সব খরচ আমার।

বল কি? রাতারাতি আবু হোসেন বনে গেলে নাকি? ঠিক আছে, আমি 'আসমা' মানে আমার মডেলকে ফোন করে দিচ্ছি। 'আসমা' আসলে এয়ারহোস্টেস ছিল। সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আজকাল মডেলিং করছে। দোষের মধ্যে 'আসমা' খুব ফর্সা নয় কিন্তু ফটোগ্রাফীতে ফর্সা কালোতে কিছু যায় আসে না।

'আসমাকে' ফোন করে জয়ন্ত বলল, এবার বল ত তোমার বিজনেসটা কি? কারও ক্লায়েণ্ট কেড়ে নিতে হবে?

সে সব ব্যাপারই নয়। আচ্ছা তুমি সেদিন বলেছিলে না হিমতভাইয়ের বৌ তার আগের স্বামীকে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল?

হ্যাঁ ঐ রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল বটে, তবে চন্দ্রলেখা সে লোকটাকে ফেলে দিয়েছিল, নাকি লোকটা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছিল অথবা স্যুইসাইড করেছিল তা আমি বলতে পারব না।

মোটকথা চন্দ্রলেখা নয় চন্দ্রাবতীর ঘর থেকে জানালা দিয়ে একটা লোক নিচে পড়ে মারা গিয়েছিল, এটা নিশ্চিত তো?

নিশ্চিত মানে? খবরের কাগজে কিছু পড়েছি, লোকমুখে কিছু শুনেছি, এর মধ্যে কতখানি কি নিশ্চিত তা কি কেউ বলতে পারে নাকি?

তোমার তো অনেক কিছু জানা আছে, হাই সোসাইটির অনেক খবর রাখ, প্রায়ই বম্বে যাও, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। মহিলার সঙ্গে আমার হালে পরিচয় হয়েছে, অপূর্ব সুন্দরী এবং একটি সেক্সবম্ব, তাই তার

বিষয়ে কিছু জানতে আগ্রহ হচ্ছে।

উঁহু ভেতরে আরও কিছু আছে। তুমি কি মেয়েটাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছ নাকি? জয়ন্তীভাই জিজ্ঞাসা করে।

না ভাই ব্ল্যাকমেলের ব্যাপার নেই, আমি যদি ওর বিষয়ে কিছু গোপন তথ্য জানতে পারি তাহলে হয়তো মেয়েটার সঙ্গে কিছু ফস্টিনস্টি, কিছু·· বুঝতেই পারছ, এই আর কি। তুমি যদি আমাকে কতকগুলো খবর জেনে দিতে পার তাহলে আমি তোমার বম্বে যাওয়া আসা বাবদ এখনি ক্যাশ পাঁচশ টাকা দোব। আর আমার কাজ যদি উদ্ধার হয় তাহলে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দোব

এসব খবর ত তুমি নিজে বম্বে গিয়ে কোর্টে ফাইল দেখে জেনে আসতে পার, আমাকে কেন?

ন্যাকামি কোরোনা .কার্টে যা হয়েছে তার মধ্যে গোপন কিছু নেই। আমি চাই গোপন খবর, তুমি ত কলগার্লদের একজন পাণ্ডা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস চন্দ্রা নিজে কলগার্ল এবং এখনও পেশা ছাড়ে নি, কোটিপতিরা ওর ক্লায়েণ্ট।

তুমি ঠিক ধরেছ আসত, চন্দ্রলেখা কলগার্ল, ওর আসল নামই চন্দ্রলেখা, প্রথমবার বিয়ে করার সময নামটা বদলেছে। যাইহোক ভাই আমি একবার কলগার্ল নিযে ভীষণ ঝামেলায় পড়েছিলুম, দিন দশ পুলিস লকআপেও ছিলুম অতিকষ্টে ছাড়া পেয়েছিলুম, নাককান মলছি ভাই আমি আর ও পথে নেই

আরে তোমার বিপদটা কোথায়? তুমি বম্বে যাবে, সেখানে তোমার জানাশোনা অনেক লোক আছে, তাদেরই কাছ থেকে আমাকে পুরো খবরটা এনে দেবে। লোকটাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল না লোকটা নেশার ঘোরে জানালা থেকে লাফ মেরেছিল? আদালতের সিদ্ধান্ত কি? এরপর ইনসিওরেন্স কোম্পানির ব্যাপার আছে। ইনসিওর করা ছিল কি! কতটাকা, চন্দ্রা কি ইনসিওরেন্সের টাকা পেয়েছে। মানে ব্যাপারটার সবকিছু আমি জানতে চাই।

আমি বম্বে গেলে আমার অফিস দেখবে কে?

কেন? আমি দেখব, আমি ত সবই জানি, তাছাড়া প্রীতি আছে এবং এই কয়েকটা দিন তোমার অফিস দেখাশোনার জন্যে কোনো পয়সা নোবো

না, তবে যদি নতুন কোনো ক্লায়েন্ট আনতে পারি তার বাবদ কমিশন আমি নিশ্চয় দাবি করব। আমি চাই তুমি আজই রাত্রে বরোদা-বম্বে এক্সপ্রেসে চলে যাও, এই নাও ফাইভ হাণ্ড্রেড ইন ক্যাশ প্লাস ওয়ান হাণ্ড্রেড কর দি ডিনার। ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটটা না হয় ফিরে এসে নিয়ো।

কালই যাব? এত তাড়াতাড়ি কেন?

যত তাড়াতাড়ি যাবে তত তাড়াতাড়ি টাকা পাবে। পাঁচ হাজার টাকা এখন পাবে না, ওটা পাবে আমার কাজ হাসিল হলে।

তোমার আবার কি কাজ হাসিল হবে, এই মরেছে, তুমি ত দেখছি আমাকেও এর মধ্যে জড়াবে?

আচ্ছা ইডিয়ট ত? এইজন্যই তোমার ব্যবসার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। তুমি আমাকে কয়েকটা খবর দেবে, সেই খবরগুলো আমি কাজে লাগাবো কিন্তু সেই খবর যে তুমিই আমাকে দিয়েছ তার প্রমাণ কোথায়? আর তুমি যে চন্দ্রাবতীর কেলেংকারি জানতে বম্বে যাচ্ছ তার প্রমাণ কোথায়? তুমিতো যাচ্ছ তোমার বিজ্ঞাপনের কাজে এবং সেই কাজও কিছু করে আসবে। নগদ পাঁচ হাজার টাকা মুফতসে আসবে নাকি? চল, ডিনারের সময় হয়ে এল, ওদিকে ট্রেন বোধহয় রাত্রি সাড়ে এগারোটায় ছাড়ে, ভোরে বম্বে পৌঁছবে।

ঠিক আছে তুমি আমার বন্ধুলোক কিন্তু দেখো ভাই আমাকে ফাঁসিও না যেন।

কাল মঙ্গলবার, পশু বুধবার। তুমি সব খবর সংগ্রহ করে বুধবার রাতেই বম্বে বরোদা এক্সপ্রেসে বরোদা ফিরবে, আমি বৃহস্পতিবার খবর নেবো।

তোমার ফোন নম্বর কত?

অসিত বলল, আমাকে ফোন করতে হবে না। আমি বস্‌কে অফিসে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে তোমার অফিসে আসব।

জয়ন্তীভাই বলল দেখ ভাই অসিত আমি নিজে যেমন সেফ থাকতে চাই তেমনি চাই তোমার যেন কোনো বিপদ না ঘটুক।

আমি কি এতই বোকা নাকি হে, তোমার সঙ্গে কাজকারবার করছি আর তুমি বুঝছ না।

যাক ভাই যা ভাল বোঝো কর। আমাকে ফাঁসিও না। নিজেও যেন ফেঁসো না। জানিনা তুমি কোন্ আলেয়ার পিছনে ছুটছ।

আমি অতি চালাকের মতো হেসে বিদায় নিলুম।

জয়ন্তীভাইয়ের কাছ থেকে ফেরবার পথে স্টেশনের সামনে হোটেল রাজস্থানে স্পেশাল রুটি আর দু গেলাস দুধ খেয়ে গ্রীন পার্কে ফিরলুম।

চন্দ্রা কোথায় বেরিয়েছে, তার ক্যাডিলাক গাড়ি নেই। এই সুযোগে একবার হিমতভাইকে দেখে আসি, সে কি করছে।

পা টিপে টিপে হিমতভাইয়ের ঘরে ঢুকলুম। ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। জ্ঞান ফিরেছে, চক্ষু রক্তবর্ণ, পাশের টেবিলে আধ বোতল স্কচ রয়েছে, বাকি আধ বোতল শেষ করেছেন নাকি! আমার দিকে ভাল করেই চেয়ে দেখলেন। কিছু বললেন না।

বিছানার কাছে এগিয়ে গেলুম দু চারটে মামুলি কথা বলতে, কিন্তু কাছে এগিয়ে ভয় পেয়ে গেলুম। আগে চোখে পড়ে নি এখন দেখলুম ওঁর হাতে রয়েছে '৩৮ বোরের একটি অটোম্যাটিক রিভলভার।

রিভলভারটা আমি দেখতে পেয়েছি বুঝতে পেরে তিনি সেটা বালিসের নিচে ঢুকিয়ে দিলেন।

বেশ বিরক্ত, বললেন, দরজায় নক না করে বা কিছু না বলে যে তুমি হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকলে? কি দরকার? কি চাই তোমার?

না স্যার আমার কিছু চাইনা। অফিস থেকে যখন ফিরেছিলেন তখন আপনার শরীরটা ভাল ছিল না, তাই এখন দেখতে এসেছিলুম আপনি কেমন আছেন বা আপনার কিছু দরকার আছে কি না, দরজায় নক না করে আসা ভুল হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।

তাঁর বিরক্ত হওয়ার কারণ থাকতে পারে। হাতে একটা অটোম্যাটিক ছিল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে এটা জেনেই তিনি বোধহয় অটোম্যাটিকটা সর্বদা কাছে রাখেন। এক্ষেত্রে হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকলে কিছু ঘটে যেতে পারে। তার ওপর তিনি ত আবার সর্বদাই মদে চুর হয়ে থাকেন।

আজ রাত্রে ক্লাবে যাবেন নাকি?

কটা বেজেছে?

—আমার স্যার ঘড়ি নেই। বলেই আমার নজরে পড়ল, এলগিন ড়টা আমার হাতেই বাঁধা আছে।

ঘড়ি নেই? আচ্ছা এক কাজ করতো। ঐ ড্রয়ারটা খোলো। দেখ র পাঁচটা রিস্টওয়াচ আছে। একটা ওমেগা আছে, সেইটে নিয়ে নাও।

মি উঠে ড্রয়ার খুলে বললুম, হ্যাঁ স্যার সাত আটটা ঘড়ি রয়েছে কিন্তু মগাটা গোলডেন স্যার অত দামী ঘড়ি আমি চাই না, আমি স্ট্রেব্রাইট লের এই করোনেট ঘড়িটা নিচ্ছি। এখন সাড়ে নটা বেজেছে।

যা তোমার ইচ্ছে। দেখ ত কয়েকটা ট্রানজিস্টার আছে বোধহয়। গুলো সব আমার উপহার পাওয়া। একটা 'সনি' আছে না?

আছে স্যার।

তুমি ত একা থাক, রেডিওটা তুমি নাও।

না, আমি আজ রাত্রে আর কোথাও যাব না। শরীরটা আজ ভাল নেই।

ঠিক আছে স্যার।

আমি এক ফাঁকে হিমতভাইকে লুকিয়ে এলগিন ঘড়িটা খুলে হাতে র নিলুম। তারপর দেখতে লাগলুম ট্রানজিস্টারটা চালু আছে কি না। চালু আছে। ঘড়ি অবশ্যই বন্ধ ছিল। আমি এলগিন ঘড়ি দেখে ইম বলেছিলুম।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার।

মিসেস বাড়ি আছেন কিনা জান?

না স্যার তিনি বাড়ি নেই, গ্যারাজে তাঁর গাড়িও নেই।

প্রায় স্বগতোক্তি করে বলেন, হ্যাঁ এই সময়ে তো তিনি প্রায়ই বাড়ি কেন না। কোথায় গেছেন তুমিই বা জানবে কি করে। যাকগে মরুকগে র ত মাত্র ক'টা দিন তারপর বুঝবে ঠেলার নাম বাবাজী।

হিমতভাইয়ের মেজাজ একটু ভাল দেখে আমি সাহস করে বলি, কিন্তু র মিসেস শা চান না যে আমি আপনার চাকরি করি। তিনি আমাকে ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন।

হিমতভাই একটু হেসে গলায় খানিকটা স্কচ ঢেলে বললেন, চুপকর তো, ব আমি জানি, যেমন আছ তেমনি থাক। বিয়ে থা করেছ নাকি?

না, স্যার।

খুব ভাল কাজ করেছ, বিয়ে করবে না। তার চেয়ে সাময়িকভাবে রক্ষিতা রাখতে পার, কিন্তু খবরদার বিয়ে করেছ কি মরেছ। এই আমি যেমন মরছি—আমি কি আগে ড্রি'ক করতুম নাকি? ঐ মাগি আমার সর্বনাশ করে ছেড়েছে অমন সুন্দরী মেয়ে যে অমন বদমায়েস হতে পারে কে জানত। টাকা ছাড়া আর কিছুই জানে না, অথচ সে টাকা খরচ করতেও জানে না, তবুও টাকা চাই, টাকা, টাকা, টাকা, টাকার পাহাড় জমাবে।

হিমতভাই একটু থামলেন। আর একটু স্কচ খেলেন। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, চন্দ্রা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে কখন আমি মরব, মরলেই ও অনেক টাকা পাবে, ওর নামে আমি দশ লাখ টাকা ইনসিওর করে রেখেছি, আর নতুন গড়ে ওঠা অলকাপুরীতে একটা তিনতলা বাড়িও করে রেখেছি। সে বাড়ির ভাড়া থেকে সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে মাসে ছ হাজার টাকা আয় হয়। কিন্তু আমি মরলে চন্দ্রা একটি পাই পয়সাও পাবে না, উলটে আমার দেনা শোধ করতে করতে ও ফতুর হতে যাবে। এই বাড়ি, বরোদায় দুটো বাড়ি, তামাকের ক্ষেত সব পেয়েও ধার শোধ হবে না। তবে ওর নিজের হয়তো কিছু গয়না আছে, সে আর কত? আমি মরে ওর ওপর প্রতিশোধ নোবো।

আমি মনে মনে ভাবি তাহলে আমি যে ইনসিওর পলিসিখানা দেখেছি তার বুঝি নিয়মিত প্রিমিয়ম দেওয়া হয় নি, আর এই সব সম্পত্তিও বুঁধা বাঁধা দেওয়া আছে, সুদও দিতে হচ্ছে প্রচুর। তবুও নিশ্চয় কিছু টাকা বা কোনো একটা আয় আছে, নইলে এসব চলছে কি করে? হয়তো অলকাপুরীর বাড়িখানা উনি এমনভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন যাতে ওর ওপর কারও হাত না পড়ে। কিন্তু সে বাড়ি চন্দ্রা যদি না পায় ত পাবে কে?

আবার এক চুমুক স্কচ খেয়ে বললেন, সামনের শনিবার আমার খেলা শেষ। তারপর আমি আর কোম্পানির ডিরেকটর থাকছি না, ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার দেনাদারেরা নেকড়ের পালের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে…

হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল তিনি কি বলছেন? আমাকে ধমকে বললেন, বোকার মতো দাঁড়িয়ে শুনছ কি? এখনও ঘড়ি আর রেডিও পাওনি?

ঠিক আছে ঐ ড্রয়ার থেকে নিয়ে নাও। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। না বলে বা সাড়া না দিয়ে কখনও আমার ঘরে ঢুকবে না।

হিমতভাই যে আমাকে ঘড়ি আর রেডিও দিয়েছেন তা তিনি ভুলে গেছেন। আমি মানুষটাতো ভাল নই। বাইরে সবাই আমাকে ভাল বলে জানে, কিন্তু ভিতরে আমি ভীষণ কুটিল। সাধুতা দেখাতে গিয়ে ওমেগা ঘড়িটা নিই নি। এখন লোভ হচ্ছিল, তাই আমি আর কথাটি না বলে ড্রয়ার খুলে ওমেগা রিস্টওয়াচখানা এবং একটা ট্রানজিস্টর পকেটে পুরলুম।

পকেট ট্রানজিস্টরের সঙ্গে যে একখানা খাম উঠে এসেছে সেটা খেয়াল করিনি। ড্রয়ার বন্ধ করে বললুম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ··

গেট আউট।

আমি আর কথাটি না বলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। নিজের ঘরে ফিরে এসে পকেট থেকে ঘড়ি দুটো আর রেডিও দুটো বার করলুম। দুটো ঘড়ি আর দুটো রেডিও ভাল দাম পেলেই ঝেড়ে দেবো। কিন্তু এই খামখানা কি? এটায় কি আছে? ক্রীসমাস কার্ড নাকি?

খাম খুললুম। ভেতরে দুখানা ফটোগ্রাফ। আরে সর্বনাশ! এযে দারুণ ছবি। (একখানা ছবিতে চন্দ্রা একটা শোফায় নগ্ন হয়ে বসে আছে, একজন যুবক তার ডান হাত দিয়ে চন্দ্রার বাঁ দিকের স্তন চেপে ধরে তাকে চুম্বন করছে। দুজনকেই স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। এই ছবিখানি রীতিমতো অশ্লীল। অপর ছবিখানাও আর এক যুবকের সঙ্গে আলিঙ্গন ও চুম্বনরত হলেও অশ্লীল বলা চলে না।) দারুণ জিনিস পাওয়া গেছে। এই ছবি দেখিয়েই চন্দ্রাকে ঘায়েল করব।

যেভাবে হোক হিমতভাই এই ছবি সংগ্রহ করেছেন কিন্তু তিনি ত এই ছবির সাহায্যে চন্দ্রাকে ডিভোর্স করতে পারতেন। এই ছবি কি তবে জাল নাকি, হিমতভাইয়েরও এমন কীর্তির ছবি চন্দ্রার কাছেও আছে? আর ছবিগুলো লুকিয়েও ত রাখেন নি হিমতভাই?

পরদিন সকালে আটটা বাজতে না বাজতে আমার ঘরে ইণ্টারকমে ফোন বেজে উঠল। হিমতভাইয়ের কণ্ঠস্বর।

অসিত আমি ক'টায় ক'টায় ন'টায় বেরোব, আগেও বেরোতে পারি তুমি সাড়ে আটটায় গাড়ি বার করবে। ব্রেকফাস্ট করে নাও। ঠিব আছে স্যার, আমি সাড়ে আটটাতেই গাড়ি বার করে রাখব। আমি তখন দাড়ি কামাচ্ছিলুম। তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে স্নান করে কয়েক খানা টোস্ট আর চা খেয়ে রেডি হয়ে ঠিক সাড়ে আটটায় গাড়ি বার করে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

পৌনে নটায় হিমতভাই এলেন। দামী স্যুট পরেছেন। হাতে একটা ব্রিফকেস। আগে এটা দেখি নি।

গাড়িতে ওঠবার আগে আমাকে বললেন, তুমি ত দেখছি দুদিনেই গাড়ির চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছ। আবদুলটা ফাঁকি দিত।

আমি মনে মনে খুশি হলাম।

হিমতভাই গাড়িতে উঠে বললেন, আমি এখন অফিস যাব না। তুমি আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে চল। আমি দশটার ফ্লাইটে বম্বে যাব। তবে রোজ যেমন যাও তেমনি বিকেলে আমার অফিসে যেও, আমাকে বাড়ি নিয়ে আসবে।

তাহলে স্যার আপনি নুন ফ্লাইটে ফিরে আসছেন? আমি তখন এয়ারপোর্টে গাড়ি নিয়ে আসব না?

না এয়ারপোর্টে তোমাকে আর যেতে হবে না।

আমি আর উত্তর দিলুম না। হিমতভাই বম্বে যাচ্ছেন কেন? মনে পড়ল যে বিদেশী কোম্পানিতে হিমতভাইয়ের ইনসিওরেন্স আছে তারা তো এ দেশ থেকে পাট গুটিয়েছে, তবে তাদের অবশিষ্ট কাজ তদারক করে অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস। বম্বেতে ওদের অফিস আছে।

এয়ারপোর্টে যখন পৌঁছলুম তখন প্লেন ছাড়তে অনেক দেরি। হিমতভাই গাড়ি থেকে নামলেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার টাকা পয়সা আছে?

মুখ কাঁচুমাচু করে বললুম, না স্যার। মাকে কিছু পাঠাতে পারলে ভাল হত।

ঠিক আছে তোমাকে কত মাইনে দেবো বলেছিলুম? হাজার?

হ্যাঁ স্যার।

হিমতভাই কিছু বললেন না। আমি সামনের মিরর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি উনি ব্রিফকেস খুললেন। ব্রিফকেসের ভেতর থেকে ক্যাশমেমো বইয়ের মতো একটা বই বার করলেন। পকেট থেকে বল পেন বার করে তাতে কি সব লিখে সেটা বই থেকে ছিঁড়ে নিলেন, তারপর ব্রিফকেস বন্ধ করে কাগজটা আমার হাতে দিলেন।

কাগজটা হাতে পেয়ে বুঝলুম এটা একটা হুণ্ডি। হিন্দি হুণ্ডি আমি দেখেছি তবে এটা গুজরাটি ভাষায় ছাপা। হিমতভাই গুজরাটী ভাষায় কি লিখেছেন। আমি বুঝতে পারছিলুম না।

উনি বললেন, আমার প্লেন ছাড়লে তুমি গাড়ি নিয়ে সোজা মাণ্ডবী চলে যাবে। এই যে ঠিকানা দেওয়া আছে ঈশ্বরভাই, রমনভাই— এরা আমার প্রাইভেট ব্যাংকার, হুণ্ডিটা আজই ভাঙিয়ে নিয়ো, বেশি টাকা আর বাকি নেই, তোমার এক বছরের মাইনে আর বোনাস ও ওভারটাইম সব ধরে আগাম বারো হাজার টাকা তোমাকে দিলুম। কিন্তু সাবধান, আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ ঠিক সময়ে। কারণ আরও কয়েকটা দিন আমার বাঁচা দরকার। যাইহোক আজই টাকা তুলে আজই একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলবে। না না, ন্যাশানালাইজড ব্যাংকে নয়। মাণ্ডবীতেই মানে কাছেই স্যায় মন্দিরে সুরাট ব্যাংকের ব্রাঞ্চ আছে, সেইখানে অ্যাকাউন্ট খুলবে। এই নাও, আমার সই করা এই কার্ডখানা রাখ, ওরা ইন্ট্রডাকশন চাইলে এটা দিয়ো।

বারো হাজার! আমি সত্যিই অবাক। যেন লটারির টাকা পেলুম। আমি কিছু বলবার ভাষা খুঁজে পেলুম না। হুণ্ডিটা ভাঁজ করে সযত্নে ভেতরের পকেটে রাখলুম।

হিমতভাই গাড়ি থেকে নেমে আমাকে বললেন দশটা দশ মিনিট পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে তারপর তুমি মাণ্ডবী যেয়ো। আর বিকেল চারটায় আমার অফিসে। আর কিছু না বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে কার-রেডিওটা খুলে দিলুম। কিশোর কুমারের একটা গান হচ্ছিল। বারো হাজার, তিনটে ঘড়ি, তিনটে রেডিও,

চন্দ্রাকে ব্ল্যাকমেল করার মতো ছবি, প্লাস অফিসে পাওয়া সেই পাঁচশ, যে পাঁচশ আমি জয়ন্তকে দিয়েছি বম্বে যাবার খরচ বাবদ।

অথচ আমি আসবার এক সপ্তাহ আগে এক বিখ্যাত জ্যোতিষীকে আমার কোষ্ঠী বিচার করিয়েছিলুম। তিনি বলেছিলেন, আপনার সময় খুব খারাপ আসছে, প্রাণ সংশয় হতে পারে।

একে কি বলে খারাপ সময় ?

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা মাণ্ডবী এলুম। ঈশ্বরভাই রমনভাই মাণ্ডবীর জহুরী পটির খ্যাতনামা হুণ্ডিওয়ালা। ওদের নাকি পাঁচ পুরুষের কারবার। যারা ওদের সঙ্গে কারবার করে তাদের ধারণা রিজার্ভ ব্যাংক ফেল করতে পারে কিন্তু ঈশ্বরভাই রমনভাই ফেল করবে না। রাত দুটোতেও ওদের গদিতে এসে লাখ টাকা চাইলে পাওয়া যায়। তবে টাকা জমা রাখলে ব্যাংকের চেয়ে সুদ কম আর ধার নিলে সুদ বেশি। তবে কেন এদের সঙ্গে ব্যবসায়ীরা কারবার করবে না।

ছুটির দিনে বা ব্যাংক ছুটির পর কিংবা অন্য সময়ে বিনা নোটিসে এমন কি সিকিউরিটি ছাড়া কি কোথাও কোনো ব্যাংকে টাকা পাওয়া যায়। তবে একটা ব্যাপার আছে। হুণ্ডি শোধ দেওয়ার মেয়াদের মধ্যে টাকা শোধ দিতেই হবে নইলে আর কোনো হুণ্ডিওয়ালার কাছে আর কখনও টাকা পাওয়া যাবে না। আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে আমার দরকার কি ? তবে যদি লাখ পাঁচেকের দাঁওটা মারতে পারি তাহলে না হয় হাওয়াই জাহাজে আমেরিকা পাড়ি দেওয়ার খবর নেওয়া যাবে।

গদিতে কলারওয়ালা ছোট ঝুলের সাদা পাঞ্জাবী, গায়ে মাথায় গান্ধী টুপি পরা, চোখে রুপোর ফ্রেমের চশমা পরা একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। আরও কয়েকজন ছিলেন কিন্তু তাঁকেই আমার মালিক বলে মনে হল।

গুজরাটী ভাষায় তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন, তমারে শুঁ কোই ছে ? হবে তবে কঁয়া আব্যা ছো ?

অর্থাৎ তোমার কি চাই, তুমি কোথা থেকে আসছ ? গুজরাটী কথা কিছু কিছু বুঝতে পারি কিন্তু দু একটা শব্দ ছাড়া বলতে পারি না তাই হিন্দিতেই বললুম, আমি হিমতভাই শায়ের কাছ থেকে আসছি, এই হুণ্ডিটা ভাঙাতে এসেছি।

তিনি হাত বাড়ালেন। আমি তাঁর হাতে হুণ্ডিটা দিলুম। তিনি সেটা ভাল করে দেখলেন তারপর সেটা আর একজনের হাতে দিয়ে গুজরাটী ভাষায় কি বললেন। সে লোক একটা খাতা খুলে কি সব দেখে মালিককে আবার হুণ্ডিটা ফিরিয়ে দিলেন। মালিক আর একজন লোককে ইসারা করতে সে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে একটা সিন্দুক খুলে একশ টাকার এক বাণ্ডিল এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, গুনে নাও।

আমি গুনে দেখলুম ঠিকই আছে। তারপর সুক্রিয়া ও নমস্তে জানিয়ে বিদায় নিলুম।

ন্যায়মন্দির কাছেই। একটা ছতলা বাড়ির মাথায় ইংরেজিতে বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে ব্যাংক অফ সুরাট। টাকাটা আপাততঃ সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই রাখা থাক। সেভিংস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে বেশি সময় লাগল না। পুরো বারো হাজারই আপাতত জমা দিলুম।

এই ব্যাংকের সুবিধা আছে। অল্প ভাড়ায় পার্সোনাল লকার পাওয়া যায়। ব্যাংকে যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তারা লকারে তাদের ব্যক্তিগত সামগ্রী বা কাগজপত্র জমা রাখতে পারেন কিন্তু নগদ টাকা, সোনা বা জহরত কদাচ নয়, তারজন্যে পৃথক সেফ ডিপজিট ভল্ট আছে। ভাল ব্যবস্থা। বাড়ির দলিল, লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি, সার্টিফিকেট্, জরুরী চিঠি, চাবি ইত্যাদি রাখা যায়। শুধু এই সুযোগের জন্যে অনেকে এই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলে।

ব্যাংকের কাজ মিটিয়ে বাইরে এসে এক কাপ কফি খেয়ে বাড়ি মানে গ্রীন পার্কে ফিরে এলুম। গাড়ি গ্যারাজ করলুম না, গাড়িখানা ধোয়া দরকার। নিজের ঘরে গিয়ে হাফ প্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে বেরিয়ে এসে গাড়ি ধুতে আরম্ভ করলুম। আমারই যেন রোলস, এত যত্ন করে ধুলুম, পালিস করলুম।

কাজ শেষ করে গাড়ি যখন গ্যারেজ করতে যাব ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার কাছে দাঁড়াল। এঞ্জিনে স্টার্ট দিতে যাচ্ছিলুম, স্টার্ট দিলুম না। আমিই জিজ্ঞাসা করলুম।—ম্যাডাম কিছু বলবেন নাকি?

আজ তোমার ফিরতে দেরি হল কেন?

দেরি ত হয় নি ম্যাডাম বরঞ্চ আজ সকালে সাহেবকে নিয়ে অনেক

আগে বেরিয়েছিলুম। তবে ফেরবার পথে একবার সারভিস স্টেশনে গিয়েছিলুম, ব্যাটারিটা আর ব্রেক একবার চেক করিয়ে নিলুম। আপনার কি কিছু কাজ আছে?

কাজ? তা একটা আছে। হিমত আজও রাত্রে কোথাও বেরোবে না, তুমি আমাকে আজ রাত্রে বিজু ক্লাবে পৌঁছে দেবে। সে ক্লাবে আমি নিজে ড্রাইভ করে যেতে চাই না, কোনো মেয়ে যায়ও না, ভাল স্যুট পরবে, তোমাকে ত হিমত নতুন স্যুট কিনে দিয়েছে। তারপর পৌঁছে দিয়ে রাত্রি ঠিক একটার সময় আমাকে ক্লাব থেকে বাড়ি নিয়ে আসবে।

রাত্রি একটা পর্যন্ত কি আমি গাড়িতে বসে থাকব?

চন্দ্রা একটু ভেবে বলল, নাইট শো-এ সিনেমা দেখে আসতেও পার। তারপর বাকি সময়টা না হয় গাড়িতেই ঘুমোবে।

আমি সত্যিই অবাক হলুম। চন্দ্রার স্বর অনেক কোমল, সুরও আদেশ করার মতো নয়।

আমি এখন চললুম, ভুলে যেও না যেন, রাত্রি আটটার পর যে কোনো সময়ে আমি বেরোব, তুমি রেডি থেকো।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চন্দ্রা আবার ফিরে এসে আমাকে বলল, অসিত তুমি ত তাহলে আমাদের বাড়িতে রয়েই গেলে তাহলে আর আমরা ঝগড়া করি কেন? আমরা এখন থেকে ফ্রেণ্ড আর তাছাড়া তুমি ত আর পেশাদার ড্রাইভার নও। তুমি আমাকে আর ম্যাডাম বলে ডেকো না, ভাবীজি বা বহেনজী যা তোমার ইচ্ছে তাই বলে ডেকো।

তাই বলব ভাবীজি।

এরপর চন্দ্রা আমার দিকে চেয়ে এমনভাবে হাসল যে আমার মাথা ঘুরে গেল। চন্দ্রার ডান দিকের বুকের ওপর থেকে আঁচল সরে গিয়েছিল। আমি গাড়িতে বসে না থাকলে চন্দ্রার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তুম।

মেয়েদের সঙ্গে আমার বেশ বনে, ওদের সঙ্গে আমি বেশ সহজভাবে আলাপ করতে পারি। মেয়েরাও আমাকে পছন্দ করে। তাই চন্দ্রা তার কঠোরভাব দূর করে আমার প্রতি কোমল হওয়ায় আমি মোটেই অবাক হই নি।

ভাল স্যুট আমার আছে ঠিকই কিন্তু একটা ভাল টাই আর একজোড়া

জুতো চাই। বাজে টাই আর কাবুলি পরে ত আর চন্দ্রার মতো সুন্দরীর সঙ্গে একটা নামী ক্লাবে যাওয়া যায় না।

চারটের সময় নর্মদা ভ্যালি ইণ্ডাস্ট্রির অফিসে যেতে হবে সাহেবকে আনতে। তাই খানিকটা আগেই রোলস নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। হ্যাণ্ডলুমের একটা ভাল টাই একজোড়া জুতো আর সিলকের একটা রুমাল কিনে সাহেবের অফিসের দিকে গাড়ির মুখ ফেরালুম।

পথে বেশ ভাল একটা সেলুন দেখতে পেলুম এবং এই অসময়ে খালিও ছিল। ঘড়ি দেখলুম। এখনও যথেষ্ট সময় আছে। সাহেবের অফিসে পৌঁছতে এখান থেকে পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

সেলুনের সামনে রোলস বড় একটা থামে না। সেলুনের মালিক রীতিমতো স্বন্ত্রস্ত। সেলুনে ঢুকে বললুম একটু তাড়াতাড়ি ভাই, শুধু হেয়ারকাটিং, আর কিছু নয়। সেলুনের ছোকরা মালিক বেশ চটপটে। টেপরেকর্ডারে বেশ লিলটিং সুরের একটা ফিলমী গানা চাপিয়ে দিয়ে রেকর্ড সময়ে আমার চুল কেটে দিল।

কাঁটায় কাঁটায় চারটের সময় সাহেবের অফিসে পৌঁছে গেলুম। গতকালের মতো সাহেব আজ নিশ্চল অবস্থায় ছিলেন না। প্রায় স্বাভাবিক। আমি নক করে ঘরে ঢুকলুম। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তোমাকে নক করতে কে বলেছে? সোজা চলে এলেই ত পারতে।

বুঝলুম গত রাত্রের সব ঘটনা সাহেব একেবারেই ভুলে গেছেন। তারপর বললেন যাক তুমি ঠিক সময়েই এসেছ। হুণ্ডি ভাঙিয়েছিলে?

হ্যাঁ স্যার হুণ্ডি ভাঙিয়ে সুরাট ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেছে, আপনার কার্ড দেখালুম তবুও ওরা বলল, ওদের ব্যাংকের এই কার্ডখানায় আপনি একটা সই করে দিলে ভাল হয়।

আমি কার্ডখানা সামনে ধরতেই উনি সই করতে করতে বললেন, ঠিকই বলেছে নইলে অডিট অবজেকশান হতে পারে।

উনি যখন ব্যাংকের কার্ডখানা সই করছিলেন তখন আমি লক্ষ্য করলুম ইনসিওরেন্স পলিসিখানা ওঁর টেবিলে রয়েছে। ওটা বোধহয় সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাবেন। কোথায় রাখবেন তা ত আমি জানি। ওঁর শোবার

খাটের দিকে একটা ওয়াল সেফ আছে, তার ওপর একটা ক্যালেণ্ডার ঝোলে। নিশ্চয় সেই ওয়াল সেফের মধ্যে পলিসিখানা রাখবেন।

আমাকে কার্ডখানা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, কিছু কাজ আছে অসিত। ঐ দেখ দুটো খালি এয়ার ব্যাগ রয়েছে ড্রয়ার খুলে যত কাগজপত্তর পাবে সব ব্যাগ দুটোতে ভরে নাও। ওগুলো আমার পার্সোনাল বিল, ভাউচার, চিঠি এটসেটরা।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসিখানা এবং পরে টেবিলের ড্রয়ার খুলে সীলকরা একটা খাম কয়েকখানা চিঠি আর একগাদা ফাউন্টেনপেন, বলপেন, পেনসিল, কয়েকটা ছুরি, কাঁচি আর নেলকাটার বার করলেন। শুধু নেলকাটার এবং একটা 'বিরো' বলপেন নিজের পকেটে নিলেন। বাকি সব পেন পেনসিল ইত্যাদি সব আমাকে দিয়ে দিলেন। বললেন তোমার ভাইবোন বা ভাইপোভাইঝিদের এগুলো দিয়ে দিয়ো। সব গুছিয়ে নিয়েছ? ফাইল ক্যাবিনেটের ড্রয়ারগুলো ভাল করে দেখে নাও আর কিছু কাগজ পড়ে আছে কি না। এইসব কাগজপত্রগুলো তোমাকে অ্যারেঞ্জ করে খুব তাড়াতাড়ি ফাইল করে আমাকে একটা স্টেটমেণ্ট তৈরি করে দিতে হবে, সময় আর বেশি নেই।

শেষ কথাটা তিনি একটু পরে বললেন। কেন বললেন ঠিক বুঝলুম না। তবে কি উনি টের পেয়েছেন চন্দ্রা কবে ওঁকে খুন করবে বা খুন করবার চেষ্টা করবে?

হয়েছে অসিত? এবার তাহলে চল।

হিমতভাই উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ার থেকে বেরিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে দেওয়ালে একটা হ্যাণ্ডেল ধরে টানলেন। বাঁ হাতে অবশ্য তাঁর সেই ব্রিফকেসটা ধরা ছিল।

এখানে যে একটা দেওয়াল আলমারি ছিল তা আমার জানা ছিল না। আলমারির পাল্লা খুলতেই দেখলুম অনেকগুলো নতুন মদের বোতল এবং অনেকগুলো কাটগ্লাসের ভাল গেলাস রয়েছে। টুকিটাকি আরও দুএকটা জিনিস রয়েছে।

বললেন, এগুলো শুক্রবার নিয়ে যাব। সেদিন বেতের বাক্স আনতে

হবে। বেতের বাক্স বাড়িতে আছে, তুমি আমাকে সেদিন সকালে অফিসে আসবার সময়ে মনে করিয়ে দিয়ো।

অল্পস্বল্প মদ খাই তাই মদের কিছু খবর রাখি। যে কটা বোতল চোখে পড়ল সবকটা বিদেশী। এদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা সস্তা সেটারই দাম অন্ততঃ দুশো টাকা।

আমি বললুম ঠিক আছে স্যার, যদি বলেন বাক্সগুলো কোথায় আছে তাহলে আমিই সেগুলো বার করে দেখে ঝেড়েঝুড়ে রাখতে পারি।

তাই হবে, নাও চল।

এয়ারব্যাগ দুটো হাতে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম। তারপর গাড়ির সামনে এসে একটা দরজা খুলে সাহেবকে বসিয়ে এয়ারব্যাগ দুটো লগেজ বুকে রাখতে যাচ্ছিলুম। উনি বললেন, উঁহু ও দুটো এখানে আমার পায়ের কাছে রাখ।

বাড়ি ফেরবার পথে বললুম, ম্যাডাম আমাকে বলছিলেন আজ রাত্রে আপনি নাকি আর বেরোবেন না। উনি বলছিলেন আজ রাত্রি আটটার সময় ওঁকে বিজু ক্লাবে নিয়ে যেতে। উনি নাকি রাত্রে একা গাড়ি চালাতে আর সাহস করছেন না।

অ, উনি এই কথা বলেছেন? তাহলে ঠিক আছে, আমি বেরোব না, যদি বেরোই তাহলে নিজেই বেরোব খন।

বাড়িতে পৌঁছে ব্রিফকেস হাতে হিমতভাই আগে আগে চললেন, আমি এয়ার ব্যাগদুটো হাতে নিয়ে ওঁকে অনুসরণ করছি। ওপরে বারান্দায় উঠে যখন ওঁর বসবার ঘরের দরজায় ঢুকব তখন কোন্ দিক থেকে চন্দ্রা এসে আমাকে বললেন অসিত মনে আছো তে? আটটায় বেরোব।

মনে আছে ভাবীজী, আমি হাসলুম।

হিমতভাই ততক্ষণ ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। চন্দ্রার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। চন্দ্রাও হাসল। হাসিটার একটা অর্থ আছে কিন্তু সে অর্থ আমি তখন ধরতে পারলুম না।

দাড়ি কামিয়ে স্নান করে ফিটফাট হয়ে আমি আটটার কয়েক মিনিট আগে গ্যারাজ থেকে চন্দ্রার ক্যাডিলাকখানা বার করলুম। চন্দ্রার একজন ক্লিনার আছে। সে রোজ এসে গাড়ি ধুয়ে ঝেড়েঝুড়ে মুছে পালিস করে দিয়ে যায়।

ছানি গ্রামের ক্লকটাওয়ারে ঢং ঢং করে আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দেখি বাড়ি থেকে চন্দ্রা বেরিয়ে আসছে। এ যে দেখছি মেমসাহেব। চন্দ্রা টকটকে লাল রঙের লম্বা ঝুলওয়ালা একটা ফ্রক পরেছে। বক্ষযুগল অর্ধ-উন্মুক্ত, পিট পুরো উন্মুক্ত। মাথায় নিজের চুলের ওপর সোনালী উইগ পরেছে। দারুণ দেখাচ্ছে চন্দ্রাকে।

গাড়িখানা টু-সিটার। পিছনে একটা বাস্কেট সিট আছে। চন্দ্রা গাড়িতে উঠে আমার পাশে বসল প্রায় গা ঘেঁসে। হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে কি একটা যেন খুঁজতে খুঁজতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, কেমন মানিয়েছে বল ত অসিত ?

সত্যি কথা বলব ভাবীজি ? উর্বশীকে দেখি নি, উর্বশীও এত সুন্দরী ছিল না বোধহয়।

শোনো অসিত আমরা বিজু ক্লাবে যাচ্ছি না, আমরা এখন যাব বরোদা ক্লাবে। বরোদা ক্লাবের ড্যানসিং ফ্লোরটা বেশ বড়। ওখানে একটা স্কেটিং রিংকও আছে। আরও একটা মজা, ওখানে নানারকম খাবার করে না, এই বড় জোর চার পাঁচ রকম, বিজুর চেয়েও প্রত্যেকটার দাম কম, চল আমরা সেখানেই যাব।

আমি মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করি ওখানে বার আছে ?

না, ওরা এখনও লাইসেন্স পায় নি, আর থাকলেই বা কি আমার তো পারমিট নেই। তোমারও নেই নিশ্চয়। যাকগে চল ত ওখানেই যাই, ইট ড্রিংক অ্যাণ্ড বি মেরি, টুমরো উই শ্যাল ডাই।

বরোদা ক্লাব নামটা বড় সেকেলে, কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখলুম, ক্লাবটি অত্যান্ত আধুনিক। বেশ ভিড় দেখলুম, সবাই যুবকযুবতী, আমাদের বয়সী খুব কম মেয়ে পুরুষই চোখে পড়ল।

ক্লাবে চন্দ্রা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একটা সাড়া জেগে উঠল। সর্বত্র একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল, এমন কি ব্যাণ্ডও যেন বেশ জোরে বেজে উঠল। সকল যুবক ঘাড় বেঁকিয়ে চন্দ্রার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। মেয়েরাও চেয়ে দেখল কিন্তু তাদের দৃষ্টি বা মন্তব্য স্বতন্ত্র। আমি শুনতে পেলুম একজন ত বেশ স্পষ্ট করেই বলল, ছিনাল !

ক্লাবের ভিতর ঢুকে চন্দ্রাও বদলে গেল। আমার সঙ্গে যেন তার

প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক। সকলের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে সে আমার সঙ্গে নাচতে লাগল। আমি ত আনাড়ি। স্টেপিং জানি না কিন্তু চন্দ্রাই আমাকে নাচাতে লাগল, গায়ে গা ঠেকিয়ে, গালে গাল ঠেকিয়ে। ফিস ফিস করে বলল, এই এখানে যেন আমাকে কিস করে বোসো না, বেআইনী। তবে আমাকে আরো টিপে ধরতে পার।

খাওয়াও বেশ ভাল। চন্দ্রা বলল, তোমাকে দাম দিতে হবে না, এখানে আমার ক্রেডিট কার্ড আছে।

আমরা মোট তিন পাল্লা নাচবার পর চন্দ্রা বলল, আমি একটু টয়লেট থেকে আসছি, এখনি আসব।

আমি একজায়গায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলুম। পাঁচমিনিট তো দেখতে দেখতে কেটে যাওয়ার কথা। আমি সমবেত যুবকযুবতীদের পোশাক ও চালচলন লক্ষ্য করতে লাগলুম। পোশাকের কোনোই নিয়ম নেই। পুরুষরা হাফ প্যাণ্ট ছাড়া সকলে যার যা ইচ্ছে পরে এসেছে। মেয়েদের মধ্যে জিনের সংখ্যাই বেশি। চন্দ্রা বলল, এখানে চুম্বন বেআইনী কিন্তু থামের আড়ালে বা যেখানে আলো কম সেখানে ত চুম্বন বেশ চলছে⋯⋯ আরে, পনের মিনিট হয়ে গেল! চন্দ্রা কি ক ছে?

একটি মেয়ে কাঁধ থেকে ট্রে ঝুলিয়ে সিগারেট, চকোলেট, টফি ও থ্রোট ট্যাবলেট বিক্রি করছিল। তার কাছ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে অনুরোধ করলুম, লেডিস টয়লেটে একবার দেখে আসতে পার? মাথায় সোনালী চুল, লাল ফ্রক পরা একটি মহিলা এখনও আসছেন না কেন?

চন্দ্রা? সে ত অনেকক্ষণ চলে গেছে, টয়লেটের ওদিকে একটা দরজা আছে সেদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

তুমি ঠিক দেখেছ?

আরে এ বলে কি? চন্দ্রাকে আমি চিনি না, মিনিট পনেরো ত বটেই, বেশি ত কম নয়।

চন্দ্রা এক চাল চেলেছে। আমাকে ইচ্ছে করেই এখানে নিয়ে এসেছিল। আমাকে বসিয়ে রেখে সে নিশ্চয় গ্রীন পার্কে নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে। গ্রীন পার্কে হিমতভাইও এখন একা। রাত্রি দশটা বেজেছে। চন্দ্রার কোনো ভাড়াটে লোক এতক্ষণে হয়তো কাজ শেষ

করেছে কিংবা চন্দ্রা ফিরে গিয়ে নিজেই হয়তো কাজটি শেষ করেছে। আমি গ্রীন পার্কে ফিরে দেখব সব শেষ হয়ে গেছে। হিমতভাই আর ইহজগতে নেই।

হিমতভাইয়ের জন্যে আমি যে একটা খুব দুঃখ অনুভব করলুম তা নয়, আমার মনে হল আমার হাত দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা ফসকে গেল।

এখন গ্রীন পার্কে ফেরা দরকার। বাইরে এসে দেখি চন্দ্রার ক্যাডিলাক নেই এবং পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার পার্সটিও নেই। এই পার্সেই যা ছিল, তাছাড়া আমার কাছে কানাকড়ি নেই। নাচবার সময় গায়ে গা ঠেকিয়ে চন্দ্রা আমার পকেট থেকে পার্সটিও তুলে নিয়েছে নিশ্চয়।

এখন গ্রীনপার্কে ফিরবো কি করে? বাড়ি ফিরে যে অটো-রিকশ বা ট্যাকসি ভাডা দেবো তারও উপায় নেই। মেয়ে তো নয়, শয়তান! কি করব ভাবছি। এমন সময় দেখি একজন সুদর্শন যুবক তার গাড়ির দরজা খুলছে। পিছনে আর একটি যুবক দাঁড়িয়ে। অসহায়ের মতো আমি তাদের দিকে ছুটে গেলুম।

তোমরা কোন্ দিকে যাবে ভাই?

ফার্টিলাইজার নগর, কেন?

আম যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। বললুম, আমি ছানি যাব কিন্তু ট্যাকসি বা অটোরিকশ ওদিকে যেতে রাজি হচ্ছে না, আমাকে একটু লিফট দেবে? আমার তাড়াতাড়িও আছে।

তোমার সেই লাল কমপ্যানিয়ন কোথায় গেল?

বুঝলুম ওরা চন্দ্রাকে লক্ষ্য করেছে কিন্তু এদের ত বলতে পারি না যে সে আমাকে ফেলে সটকে পড়েছে। একটা মিথ্যা কথা বললুম, আরে সে তো গেছে বিজু ক্লাবে, সেখান থেকে একজনকে নিয়ে স্টেশনে যাবে। স্টেশন থেকে এসে আমাকে নিয়ে যাবে, অথচ আমাকে সাড়ে দশটার মধ্যে ছানি পৌছতেই হবে। প্লিজ তোমরা যদি একটু লিফট দাও?

উইথ প্লেজার কিন্তু অন ওয়ান কণ্ডিশন।

কি কণ্ডিশন?

শনিবার এই ক্লাবে আমরা আবার আসব, ইউ ব্রিং ছাট-গার্ল এবং আমাদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে।

আমি ত সঙ্গে সঙ্গে প্রমিস করলুম। ওরা আমাকে গাড়িতে তুলে নিল এবং দশ মিনিটের মধ্যে ছানি বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে নামিয়ে দিল।

গাড়ি থেকে নেমে আমি যুবক দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রীন পার্কের দিকে একরকম ছুটতে লাগলুম। যুবকদের গাড়ীর লাল ব্যাকলাইট অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা আরও খানিকটা আগে যাবে।

গ্রীন পার্কের গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি গ্যারাজ ঘরে আলো জ্বলছে। গাছের ও বাগানের ঝোপের আড়ালে যতটা সম্ভব গ্যারেজের কাছে এগিয়ে গেলুম।

একটা লতাকুঞ্জের আড়াল থেকে দেখলুম চন্দ্রার ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। চন্দ্রা তার লাল ফ্রক ছেড়ে রেখে একটা সবুজ চানিয়া ও সবুজ খাটো ব্লাউস পরেছে।

বিউইক গ্যারাজে আলো জ্বলছে। হিমতভাই মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। শরীরটা কাঁপছে বুঝি। তাহলে এখনও সর্বনাশ হয় নি, তবে সর্বনাশের একটা চেষ্টা চলছে হয় তো।

আমি অনুমান করলুম চন্দ্রা কোনোভাবে হিমতভাইকে বিউইক গাড়িতে তোলবার চেষ্টা করছে। ঐ গাড়িতে তুলে নিজেই হয়তো ড্রাইভ করে কোথাও হাইওয়ের ধারে ছেড়ে দিয়ে আসবে। হাইওয়ে দিয়ে রাত্রে প্রচুর অয়েলট্যাংকার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে যায়। হাইওয়েতে রাস্তার ধারে স্ট্রীটলাইট থাকে না। বিউইকের ব্যাকলাইটও জ্বলবে না। যে কোনো অয়েল ট্যাংকার বিউইক গাড়িখানাকে ধাক্কা মেরে তচনচ করে দিতে পারে। তারপর রোলস এবং ক্যাডিলাক অপেক্ষা পুরনো মডেলের এই বিউইক গাড়িখানার দাম কম, বাকি দুটো গাড়ি বেচলে বেশি দাম পাওয়া যাবে। মাথা খাটিয়ে দারুণ প্ল্যান বার করেছে তো?

হিমতভাই উপুড় হয়ে শুয়েছিল। আমি দেখলুম চন্দ্রা তার চানিয়াটা গুটিয়ে কাছা দিয়ে ইজেরের মতো করে পরে নিল। তারপর বেশ সহজে হিমতভাইকে খানিকটা টেনে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিল।

হিমতভাই কথা বলছেন। চন্দ্রাকে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, আরে, তুমি অত টানাটানি করছ কেন, আমি ত তোমাকে বাধা দিচ্ছি না।

কে আমাকে বাধা দেবে প্রাণেশ্বর? বলে চন্দ্রা হিমতভাইকে ধরে

অবলীলাক্রমে দাঁড় করিয়ে দিল। মেয়েটার শক্তি দেখে আমি ও
অবাক।

এদিকে হিমতভাই সেদিন মাতাল হন নি এবং মাতালের অভিন
করছিলেন তা আমি তাঁরই মুখ থেকে পরে শুনেছিলুম।

চন্দ্রাকে হিমতভাই আবার বললেন, সেই কথাই ত বলছি বৌদি
তোমাকে ত আমি বাধা দিচ্ছি না, সাহায্যই করছি, তুমি মিছেমিছি আমাকে
নিয়ে টানাটানি করছ।

ন্যাকামি? বৌদি? নাও গাড়িতে ওঠ, বৌদিই বল আর শালীই
বল আজ তোমার নিস্তার নেই।

চন্দ্রা তার পরনের চানিয়া ইজেরের মতো গুটিয়ে এতক্ষণ পরেছিল,
এখন সেই গোটানো অংশ খুলে নামিয়ে দিল। গ্যারাজে ওরই একটা
চেক টি-শার্ট কোথাও ঝুলছিল, সেটা গায়ে দিয়ে গাড়িতে যখন উঠতে যাচ্ছে
তখন আমি আর থাকতে পারলুম না, আড়াল থেকে বেরিয়ে এলুম।

আশ্চর্য কড়া নার্ভ চন্দ্রার। আমাকে আচমকা দেখে সে মোটেই
বিচলিত হল না। বলল, এই যে অসিত তুমি এসে পড়েছ? কোথায়
ছিলে? টয়লেট থেকে ফিরে এসে তোমাকে কোথাও দেখতে পেলুম না,
কোথায় গিয়েছিলে আমাকে একা ফেলে? শোনো হিমত একবার ক্লাবে
যাবেই যাবে, কোনো কথা শুনল না, তুমি ওকে একটু নিয়ে যাও।

আমি কোনো উত্তর দিলুম না, শুধু বললুম, মিঃ শাকে আমি নিয়ে
যাচ্ছি, আপনি যান, শুয়ে পড়ুন, আমি মিঃ শাকে ফিরিয়ে এনে ওঁর ঘরে
শুইয়ে দেবো।

আমি গাড়িতে উঠে ড্রাইভারের সিটে বসে এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে
হিমতভাইকে নিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে এলুম।

গেট থেকে বেরিয়ে একশ গজ রাস্তা গেছি কি না গেছি হিমতভাই
হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। এতক্ষণ তিনি মাথা নিচু করে ঢুলছিলেন।
তিনি বললেন, অসিত পাশে ঐ কাঁচা রাস্তার ধারে গাড়ি রাখ, আমি
কোথাও যেতে চাই নি বা যাবও না, বুঝতেই পারছ ও তোমাকে সরিয়ে
দিতে চাইছিল। ও যখন আমার ঘরে ঢুকল তখনই আমি মাতালের ভান
করলুম, এসব আমি আগেই ভেবে রেখেছিলুম। তুমি আমার দিকে

অমনভাবে চাইছ কেন ? ভুত দেখছ ? তুমি ফিরলে কি করে ? এই নাও তোমার পার্স।

কি করে আমার পকেট থেকে পার্স চন্দ্রার কাছে গেল এবং চন্দ্রার কাছ থেকে হিমতভাইয়ের কাছে এল সে রহস্য আপাততঃ মুলতুবি থাক।

দুজন ছোকরা আমাকে লিফট দিয়েছিল। তাই আমি ঠিক সময়ে এসে পড়তে পেরেছি, নইলে মিসেস শায়ের পক্ষে এই রাত্রে ড্রাইভ করা অসুবিধে হত।

কচু হত, কোন্ চুলো থেকে ক্যাডিল্যাক হাঁকিয়ে এল। ওসব কিছু নয়, আমার দশ লাখ টাকা ইনসিওর করা আছে, মরে গেলে ঐ টাকা সে পাবে এইজন্যে ও যতশীঘ্র সম্ভব আমাকে খারিজ করতে চায়, অত রূপ যার সে এমন শয়তানী হয় কি করে বলতে পার ?

রূপসীরাই ত সর্বনাশ করে বলে শুনেছি স্যার কিন্তু আপনি যা বললেন তা ত আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

তুমি এখনও ছেলেমানুষ, দুনিয়ার কিছু জান না, এখন গাড়ি ঘোরাও, বাড়ি ফিরে চল। তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে, নইলে ও আজ আমাকে মারবার চেষ্টা করত।

তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। আমি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চললুম। রাস্তায় স্ট্রীট লাইট না থাকলেও খুব অন্ধকার নয়। রাস্তার এক পাশে বড় বড় সব কারখানা। সেইসব কারখানায় সারারাত্রি ফ্লোরেসেণ্ট আলোয় ঝলমল করে। এ ছাড়া বায়ু যাতে দূষিত না হয় সেজন্যে ইণ্ডিয়ান পেট্রোকেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রির কর্তৃপক্ষ সুউচ্চ চিমনি থেকে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস জ্বালিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

রাবনের চিতার মতো তিনটে চিমনি থেকে নিরন্তর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের আলোতেও রাস্তা বেশ দেখা যায়। রাস্তার দুপাশে ঘন গাছ না থাকলে আলো আরও একটু বেশি পাওয়া যেত।

এই আলোর জন্যেই চন্দ্রার প্ল্যান ব্যর্থ হত। ব্যাকলাইট না জ্বাললেও এবং অয়েল ট্যাংকার তাদের হেডলাইট না জ্বাললেও রাস্তার মাঝখানে মস্ত বড় একটা বিউইক গাড়ি ট্যাংকার বা লরি ড্রাইভারদের দৃষ্টি এড়াত না।

বাড়ি ফিরে আমি গাড়ি গ্যারাজে তুলে দিলাম। হিমতভাই ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। গাড়ি তোলা হলে বললেন, রাত্রে তুমি আজ থেকে আমার পাশের ঘরে ঘুমোবে, যাও পোশাক পালটে এস আমি এখানে ওয়েট করছি।

আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে ছুটে যেয়ে স্যুট ছেড়ে পাজামা গেঞ্জি পরে চলে এলুম। হিমতভাইকে নিয়ে যখন ওপরে বারান্দায় উঠেছি তখন দেখি গায়ে শুধু তোয়ালে জড়িয়ে বারান্দার ওপাশের বাথরুম থেকে চন্দ্রা বেরিয়ে এল।

বুকের কাছে তোয়ালেটা চেপে ধরে বিষদৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগল। হিমতভাই বললেন, কি গো বিবি অবাক হয়ে দেখছ কি? অসিত আমার কাছে শোবে তাই ও পাজামা আর গেঞ্জি পরে এসেছে।

চন্দ্রার দিকে চেয়ে আমি মৃদু হাসলুম। আমার হাসি বলতে চাইল তোমার ষড়যন্ত্র আমি বুঝতে পেরেছি। হাসির অর্থ চন্দ্রা ধরতে পেরেছিল কিনা জানিনা। আজ যদি একটা কাণ্ড ঘটে যেত তাহলে পুলিস আমাকেও ছাড়ত না। হিমতভাইয়ের ড্রাইভার সেজেগুজে তার বৌকে নিয়ে বেরিয়েছিল কি মতলবে?

হিমতভাইকে বিছানায় শোয়াবার সময় জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি যখন স্ত্রীর বিপদের আশংকা করছেন তখন পুলিসকে খবর দিচ্ছেন না কেন?

আরে চন্দ্রার লোলুপ নজর তো আমার দশ লাখ ইনসিওরের ওপর, সে যাতে ঐ দশ লাখের একটা টাকাও না পায় আমি তার ব্যবস্থা করেছি।

তাহলে সেই দশ লাখ টাকা কে পাবে? বম্বে যেয়ে ইনসিওর কোম্পানির অফিসে হিমতভাই কি মৃত্যুর পর অর্থ প্রাপকের নাম বদল করে এসেছেন? নাকি তিনি অনেক কিস্তি প্রিমিয়ম বাকি রেখেছেন?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি এইসব অদ্ভুত চিন্তা করতে লাগলুম। টাকা যদি চন্দ্রা না পায় তাহলে আমি মাথা ঘামাচ্ছি কেন? তার চেয়ে এই ধনীগৃহ থেকে মূল্যবান সামগ্রী যা পাওয়া যায় তা নিয়ে চুপিচুপি সরে পড়াই ভাল। এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সব চিন্তা মুলতুবি রাখলুম। এখন খালি ঘটনার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করা যাক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

চন্দ্রাকে যাতে ঘায়েল করা যায় তার কিছু প্রমাণ তো হস্তগত হয়েছে এখন জয়ন্তীভাই বম্বে থেকে কি তথ্য সংগ্রহ করে আনে দেখা যাক।

অফিস যাবার পথে সেদিন হিমতভাই গাড়িতে আমার সঙ্গে প্রায় কোনো কথাই বললেন না। অফিসে পৌঁছে নামবার সময় বললেন, অসিত তুমি আজ থেকেই আমার বেডরুমের পাশে ড্রেসিংরুমে থাকবে, গ্যারাজ থেকে তোমার সব জিনিসপত্তর এনে রাখবে। আমি চাই আমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকব ততক্ষণ তুমি আমার কাছে কাছে থাকবে। বুঝেছ?

হ্যাঁ স্যার, আপনি যেমন বলবেন তেমনই হবে।

বাড়ি ফিরে আমার মালপত্তর হিমতভাইয়ের ড্রেসিংরুমে সরিয়ে নিয়ে গেলুম। তারপর স্নান করে গাড়ি নিয়ে বরোদায় গিয়ে একটা রাজস্থানী হোটেলে পেটভরে খেয়ে মুন শোয়ে সিনেমা দেখে ঠিক চারটের সময় সাহেবকে আনতে গেলুম।

আমার আফশোষ এই চাকরিটা আমার কলকাতায় হল না কেন? তাহলে রোলস দেখিয়ে তাদের অবাক করে দিতুম। আমার যেসব বন্ধু মাঝে মাঝে ট্যাকসি হাঁকিয়ে যায় তাদের লিফট দিতুম।

গাড়িতে তোলবার সময়ই বুঝলুম, বাবু আজ প্রচুর মদ্যপান করেছেন। আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। বেশ গম্ভীর, তাছাড়া বেশ বোঝা গেল ওঁর মন ভাল নেই।

গাড়ি থেকে নামিয়ে যখন ঘরে পৌঁছে দিলুম তখন বললেন, অসিত আমি আটটার সময় ক্লাবে ডিনারে যাব, রেডি থেকো। দেখ তো চন্দ্রা বাড়িতে আছে কি না। ভাল করে দেখবে।

আমি প্রথমেই ওর বেডরুম দেখলুম, তালা বন্ধ। তারপর গ্যারাজ দেখে এলুম, ক্যাডিলাক নেই। তবুও সারা বাড়িটা দেখে এলুম, না চন্দ্রা কোথাও নেই। সাহেবকে সে কথা বললুম। তিনি কিছু বললেন না। আমি কিচেনে গিয়ে চা তৈরী করলুম এবং কিছু জলপান। তারপর সাহেবের পাশের ঘরে এসে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইলুম।

আটটার কয়েক মিনিট আগে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে দরজার সামনে রাখলুম। আটটার কয়েক মিনিট পরেই হিমতভাই নিচে নেমে

গাড়িতে উঠে বললেন ওভারসিজ ক্লাবে চল। আজ আমি সেলিব্রেট করব।

যেসব ধনী গুজরাটীরা প্রধানতঃ পূর্ব আফ্রিকায় ব্যবসা করে তারা মাঝে মাঝে দেশে আসে। তারাই এই ওভারসিজ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। আমেদাবাদে প্রথম ওভারসিজ ক্লাব হয়, তারপর বরোদায়, এখন রাজকোটেও একটা শাখা হচ্ছে। ওভারসিজ ক্লাবে মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই হয়, সেই সঙ্গে খানাপিনা। মাঝে মাঝে গানের মজলিস বসে।

সেলিব্রেট করবেন? কি সেলিব্রেট করবেন? নিজের জন্মদিন? তাছাড়া সেলিব্রেট করার আর ত কিছু দেখছি না। তবে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলুম না। গাড়ি থেকে নেমে সাহেব ভেতরে চলে গেলেন।

পার্ক করার জায়গায় আমি গাড়ি পার্ক করে রাখলুম। গাড়িতে বসেই রইলুম। টেনিস লনে ফ্লাডলাইটে টেনিস খেলা চলছে, একটা বড় হলঘরের একদিকে বিলিয়ার্ড আর অপর দিকে টেবিলটেনিসও চলছে। ভেতর থেকে নানারকম মৃদু সঙ্গীত ভেসে আসছে। কখনও সানাই, কখনও বেহালা, কখনও সেতার বা বেহালা। সবই ভারতীয় সঙ্গীত। বিদেশে নাকি বিলিতি সঙ্গীত শুনে শুনে কানে তালা ধরে গেছে তাই ভারতীয় সঙ্গীতের ব্যবস্থা।

আমি আর কি করি। সঙ্গে স্টিফেন কিং-এর ফায়ার স্টার্টার বইখানা সাহেবের রাইটিং টেবিল থেকে তুলে এনেছিলুম, সেখানা পড়তে লাগলুম। বইখানার নাম শুনেছিলুম, ওখানা আমেরিকায় এখন বেস্ট সেলার।

রাত্রি এগিয়ে যাচ্ছে। দশটা বেজে গেল হিমতভাইয়ের ফেরার নাম নেই। ক্ষিধেতে পেট চুঁই চুঁই করছে। এমন সময় সার্ট আর পাজামা পরা ক্লাবেরই বোধহয় একজন খানসামা এসে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, খানা লাগবে নাকি?

লাগবে বই কি? তাহলে তিনটে টাকা দাও। দিলুম তিনটাকা। সে আরও অনেক ড্রাইভারের কাছ থেকে টাকা আদায় করে চলে গেল। আধঘণ্টা পরে সে প্রত্যেককে একটা করে প্লাস্টিকের প্যাকেট দিয়ে গেল। খানিকটা ফ্রায়েড রাইস, ফিশ ফ্রাই, কাশ্মীরী আলুর দম আর ক্ষীরের

রফি। প্যাকেট দিয়ে বলল, জল পাবে না তবে একটু পরে কফিওয়ালা
াসবে, কাগজের গ্লাস দেবে, ষাট পয়সা দিয়ো।

রান্না অতি উত্তম, কফিও অতি উত্তম, সবটাই দুধের তৈরি। খেয়ে
প্ত হলুম। বইখানা আবার পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। একজন আমার মাথায় টোকা মারছিল। সে
লল, চল তোমার সাহেবকে নিয়ে আসবে চল। তাঁর নড়বার ক্ষমতা
নই। ঘড়ি দেখলুম। রাত্রি প্রায় একটা। আমি ও সেই লোকটি
'জনে ধরাধরি করে সাহেবকে এনে গাড়িতে বসিয়ে দিলুম। তাঁর বসবার
্মতা ছিল না, শুয়ে পড়লেন সিটে।

বাড়ি ফিরে অন্য দিনের মতোই সাহেবকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে
বছানায় শুইয়ে দিলুম। অজ্ঞান, অচেতন। ইচ্ছে করে কয়েক জায়গায়
্মটি কেটে দেখলুম তিনি বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। এই সুযোগে ওয়ালসেফটা খুলে
েখা যাক ইনসিওরেন্স পলিসিটার কি অবস্থা।

ক্যালেণ্ডার সরিয়ে সিন্দুকের নব ধরে অনেক নাড়াচাড়া করলুম কিন্তু
ন্দুক খুলল না। আমার ভয় সাহেবকে নয়, সাহেব হঠাৎ যদি জেগে
ঠে আমাকে তো বলব কিসের যেন একটা আওয়াজ শুনলুম। তাই ওঘর
থকে ছুটে এসে দেখছি।

আমার ভয় চন্দ্রাকে। সে যদি কোথাও থেকে হঠাৎ এসে পড়ে?

সাহেবের ঘরে স্টীলের একটা ডোয়ার্ফ আলমারি আছে। সেটা
কবার দেখতে পারলে হতো। চারদিক শান্ত। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে
ীলের আলমারিটাও দেখলুম। সেটাও বন্ধ।

ড্রেসিংরুমে সাহেবের অনেক কোট ঝুলছিল। প্রতিটা কোটের প্রতিটা
কেট দেখলুম। কোন পকেটে কোন চাবি নেই। না থাকাই সম্ভব, চন্দ্রা
াতে চাবির নাগাল না পায় সেজন্য সাহেব চাবি নিশ্চয় লুকিয়ে রাখেন।
বুও বালিশের নিচে, গদির নিচে সাবধানে হাতড়ে দেখলুম। চাবি
কাথাও নেই।

কি আর করি। ড্রেসিংরুমে ফিরে এসে পোশাক পালটালুম। ঘুম
াসছে না। একটা সিগারেট ধরালুম। সিগারেটটা শেষ হতে মাঝের
জাটা খুলে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম।

আগামীকাল জয়ন্তীভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা। দেখি সে কিছু খবর আনতে পেরেছে কি না। কি খবর আনতে পারে, অনেক কিছু অনুমান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমি চুপিসারে আমার গ্যারাজ ঘরে চলে গেলুম। তখনও সূর্য ওঠেনি। এক কাপ কফি তৈরি করলুম। দাড়ি কামালুম, তারপর জয়ন্তীভাইকে টেলিফোন করলুম।

আরে ওঠো ওঠো, কতোবেলা পর্যন্ত ঘুমোবে, কখন আটটা বেজে গেছে। শুনে জয়ন্তীভাই ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। আমি ওকে যখন ফোন করেছিলুম তখন সাতটা বেজেছিল আর ও তখনও ঘুমোচ্ছিল।

বিরক্ত হয়ে বলল, দূর সবে সাতটা, আটটার আগে আমি উঠি না, দিলে ত ঘুমটা নষ্ট করে।

আরে আটটা বেজে গেছে না বললে তুমি উঠতে নাকি? যাইহোক এখন দাঁত মেজে সোজা আমার ঘরে চলে এসো। এখানে দাড়ি কামাবে, ব্রেকফাস্ট করবে।

এত তাড়া কিসের? আমি তোমার ওখানে যাব না, তার চেয়ে তুমি আমার অফিসে এসো।

কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর জয়ন্তীভাই আমার গ্যারাজ ঘরে এল। দাঁত মেজে, দাড়ি কামিয়ে এক কাপ ব্ল্যাক খেয়ে চলে এসেছে। আমি ওকে চা, টোস্ট, ডিমসেদ্ধ ইত্যাদি খাইয়ে দিলুম। কাগজে মুড়ে একটা থলেতে ভরে সেটা ওকে দিলুম। খুব খুশি।

এবার বল আমার খবর।

আর যে তর সয় না, যাক তোমার খবর ভাল। ভাগ্যক্রমে চার্চগেট স্টেশনেই আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সে একটা খবরের কাগজের কোর্ট রিপোর্টার। সেই খবরের কাগজের অফিসে বুঝি স্ট্রাইক চলছে। বেচারার মেজাজ খারাপ, তিনদিন দাড়ি কামায় নি। যাইহোক আমি ওকে একটা সেলুনে নিয়ে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে দিলুম, তারপর একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে পাওভাজি আর ক্ষীরের বরফি খাওয়ালুম, আর এলাচ-গন্ধ দুধ। বেটা একেবারে নিরামিষভোজী।

আরে তোমার গৌরচন্দ্রিকা রাখ তো।

ও ব্যাটা চন্দ্রার নাড়ী নক্ষত্রের খবর রাখে। অন্তঃত চন্দ্রা সংক্রান্ত যে একটা লাইফ ইনসিওরেন্স ক্লেম নিয়ে কেস হয়েছিল সেটার সব খবর তার জানা আছে। কেসটা খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল।

লাইফ ইনসিওরেন্স নিয়ে কেস হয়েছিল? আমি দমে গেলুম। কারণ কেউ যদি একবার এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে তাহলে পরে এমন ঘটনা ঘটলে এবং তা জেনুইন কেস হলেও ইনসিওরেন্স কোম্পানি তাকে ছাড়বে না।

জয়ন্তী বলল, কেস ত হবেই, অ্যান্টনি ডি'সুজার লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকার চন্দ্রাই ত ছিল একমাত্র দাবিদার।

ঘটনাটা পরিষ্কার করে বল তো? আমি জিজ্ঞাসা করি।

ঐ যে লোকটা যাকে চন্দ্রা জানলা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছিল সেই লোকটার নাম অ্যান্টনি ডিসুজা, গোয়ানিজ মিনারেল লাইনের মস্ত বড় এক ব্রোকার, হাজার হাজার টাকা রোজগার করত। লোকটা ছিল ব্যাচেলার, মেরিন ড্রাইভে একটা হাইরাইজ বাড়ি সাততলায়, একটা লাকসারি ফ্ল্যাটে চন্দ্রাকে নিয়ে স্বামী স্ত্রীরূপে থাকত। চন্দ্রা ছিল কলগার্ল, চন্দ্রাকে নিয়োগ করে অ্যান্টনি বড় বড় মক্কেলদের ঘায়েল করত। কলগার্ল হলেও চন্দ্রা মাঝে মাঝে মডেলিং করত, কিসের মডেলিং তা জানি না।

আর্টিস্টের নাকি শাড়ি কসমেটিকের?

তা আমি জানি না ভাই, জয়ন্তীভাই বলল।

আমার প্রশ্ন করার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। ঐ যে চন্দ্রার দুখানা অশ্লীল ছবি আমি হিমতভাইয়ের ড্রয়ার থেকে চুরি করেছি সে দুখানা কি পুরুষ মডেলের সঙ্গে পোজ দেওয়া ছবি? চলিত কথায় যাকে বলা হয় প্যারিস পিকচার? তাহলে ত চন্দ্রাকে ব্ল্যাকমেল করা যাবে না। হয়তো তাই, নইলে হিমতভাই ছবি দুখানা নিশ্চয় লুকিয়ে রাখত।

যাইহোক, জয়ন্তীভাই বলতে লাগল, চন্দ্রা নাকি তাকে বিয়ে করবার জন্যে এবং তার নামে একটা বাড়ি কিনে দিতে অথবা মোটা টাকার জীবন বীমা নেবার জন্যে চাপ দিচ্ছিল। কই হে সিগারেট টিগারেট ছাড়।

আমরা দুজনেই সিগারেট ধরাই। জয়ন্তীভাই আবার আরম্ভ করে, অ্যান্টনি বিয়ে করতে রাজি হয় না এবং বলে চন্দ্রাকে বাড়ি কিনে দেবার

মতো নগদটাকা তার হাতে নেই। তবে আপাততঃ সে লাখ টাকা ক
দুখানা জীবনবীমা চন্দ্রার অনুকূলে করে দিল। অ্যান্টনি মাসে মা
তার ব্যাংক মারফত প্রিমিয়ম দিত। চন্দ্রার তখন নাম ছিল চন্দ্রলেখা
জীবন বীমা নেবার সময় ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে অ্যান্টনির রক্তচা
স্বাভাবিক নয়, অন্য ব্যাধিও আছে। তাই তাকে উচ্চ হারে প্রিমিয়
দিতে হত। চন্দ্রা মাঝে মাঝে একজন ডাক্তারকে আনিয়ে অ্যান্টনি
চেক-আপ করাত।

সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল। অ্যাশট্রেতে সেটা গুঁজে রাখ
রাখতে জয়ন্তীভাই বলল, অ্যান্টনি যে মিনারেল লাইনে কাজ করত সে
মিনারেলের ওপর ভারত সরকার হঠাৎ ডিউটি চাপিয়ে দেয়, সেই মিনারে
এক্সপোর্ট হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। অ্যান্টনি মাথায় হাত দিয়ে বসল। এ
মিনারেল থেকেই তার প্রধান আয় হত। অবস্থা এমন দাঁড়াল
অ্যান্টনিকে অনেক খরচ কমাতে হল। এই অবস্থায়, একদিন দুপু
অ্যান্টনি হঠাৎ বাড়ি ফিরে আসে, শরীরটা ভাল নয়। চন্দ্রা তার সাক্ষ্যে
বলে একটু হাওয়ার জন্যে অ্যান্টনি জানলার ধারে গিয়ে বসে। জানলা
গ্রীল ছিল না। অ্যান্টনি কিভাবে নিচে পড়ে যায়।

চন্দ্রা তার সাক্ষ্যে এই কথাই বলেছিল। জেরার মুখে সে কিছু আবোল
তাবোল কথাও বলে ফেলেছিল। জানলার ধারে হাওয়ার জন্যে অ্যান্টনি
বসতে যাবে কেন? সমুদ্র থেকে প্রচুর হাওয়া ঘরে ঢুকত, সেদিন গুমো
গরমও ছিল না।

তবে অ্যান্টনি বাড়ি ফিরে যখন বলে যে তার শরীর ভাল নয়, চন্দ্র
তখনই নাকি ফোন করে সেই ডাক্তারকে ডাকে। ডাক্তার এসে বলে
হার্টের অবস্থা ভাল নয়। কোন নার্সিংহোমে পাঠিয়ে ইনটেনসিভ কেয়া
ইউনিটে রাখা উচিত।

চন্দ্রাও ডাক্তারকে সেইমতো অনুরোধ করে। ডাক্তার নাকি নার্সিং
হোমের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে তখনই চলে যায় এবং ইতিমধ্যে এই ঘটনা ঘটে
যায়। অ্যান্টনি জানলা দিয়ে পড়ে যায় এবং মারা যায়। পোস্টমর্টেমে
পরীক্ষায় প্রকাশ পায় যে অ্যান্টনি জানলা দিয়ে পড়বার ঠিক আগেই নাকি
তার হার্টফেল করেছিল।

ইনসিওরেন্স কোম্পানির ব্যারিস্টার বলেন যে কোন ব্যক্তির হার্ট যে কোন সময়ে ফেল করতে পারে কিন্তু জানালাটার যে পজিশন তাতে একজন অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সেই জানলায় ওঠা সম্ভব ছিল না এবং উঠলেও পড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

চন্দ্রা বলে জানালার ধারে তো সোফা ছিল। অ্যান্টনি সেই সোফায় উঠে জানালায় বসেছিল এবং সে হঠাৎ দেখে যে অ্যান্টনি ঢলে পড়ছে। সে ছুটে গিয়ে অ্যান্টনিকে ধরে কিন্তু তাকে ভাল করে ধরবার আগেই অ্যান্টনি নিচে পড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষ সঠিকভাবে কিছু প্রমাণ করতে পারে না। ইনসিওরেন্স কোম্পানির একজন বড় অফিসার কেস চলা কালে চন্দ্রার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তারই মধ্যস্থতায় ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে চন্দ্রা প্রায় এক লক্ষ টাকা পায়। এই সময়ে বম্বের তাজ হোটেলে হিমত-ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। দিস ইজ দি স্টোরি, এই স্টোরি তোমার কি কাজে লাগবে জানি না। আমি এখন চললুম, আমাকে আজই একবার আমেদাবাদ যেতে হবে।

হিমতভাইকে নিয়ে বেরোবার আমারও সময় হয়ে আসছিল। জয়ন্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলুম। জয়ন্ত অবশ্য আমাকে বারবার সতর্ক করে দিয়ে গেল। আগুনে ঝাঁপ দিয়ো না। যা তুমি সহজ মনে করছ সেইটেই হয়তো ফাঁসির দড়ি হয়ে তোমার গলায় আটকে যেতে পারে।

জয়ন্তীভাই চলে যাবার পর বেশ ভাল করে আর এক কাপ কফি তৈরি করে খেয়ে নীচে নেমে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে হিমতভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। তার অফিস যাবার সময় হয়ে এসেছে। হিমতভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভাবতে লাগলুম, নগদে ও জিনিসে বেশ কিছু মোটা টাকা আমার হাতে এসে গেছে। এখন অ্যান্টনির ঘটনা আর চন্দ্রার অশ্লীল ছবি দেখিয়ে ভীতিসঞ্চার করে যদি কিছু টাকা আদায় করতে পারি তো ভাল, নইলে ঐ জীবনবীমার দশলাখের ভাগীদার হবার জন্যে আর চেষ্টা করব না।

যাই হোক এদিন আর কোনো ঘটনা ঘটল না। সবকিছু রুটিন

মাফিক চলল। অফিস থেকে ফেরবার সময় অফিসে হিমতভাইয়ের চেম্বারে কাবার্ড থেকে কতকগুলো মদের বোতল নিয়ে এলুম। আরও কিছু বাকি রইল, সেগুলো আগামী কাল শেষ দিন নিয়ে যাবার জন্যে হিমতভাই আমাকে বলে দিলেন।

বিকেলে বাড়ি ফিরে হিমতভাই বললেন তাকে যেন সন্ধ্যার পর বা রাত্রে আমি বিরক্ত না করি, কারণ তিনি কিছু লেখালেখির কাজ করবেন। আমি অবাক। কারণ তাঁকে ত সন্ধ্যার পর বিরক্ত করার প্রশ্নই ওঠে না, তখন তিনি থাকেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে অন্যলোকে।

আমি বললুম, না স্যার আপনাকে আমি বিরক্ত করব না।

তাহলে এক কাজ কর। আমার ড্রেসিংরুমে আর একটা দরজা আছে। দরজাটা লক করা আছে, এই চাবিটা নাও। তুমি রাত্রে বা যে কোনো সময়ে সেই দরজা দিয়ে ঢুকবে তবে আমার বেডরুমের সঙ্গে মাঝের দরজাটা খোলা থাকবে।

আমি স্যার বিকেলে একটু বরোদা যাব, দু একটা জিনিসও কিনতে হবে। আর ওখানেই কোনো হোটেলে খেয়ে রাত্রি দশটার মধ্যে আমি ফিরে আসব।

ঠিক আছে, তবে ফিরতে দেরি করো না।

বরোদায় যে কয়েকটা জিনিস কেনবার ছিল সেগুলো কিনে একটু এদিক ওদিক বেড়ালুম। কখন আটটা বেজে গেছে এবং ক্ষিধেও পেয়েছে খেয়াল করি নি।

একটা ভাল রেস্তোরাঁয় ঢুকলুম। ঢুকে দেখি রেস্তোরাঁ ভর্তি।

একটা জায়গার জন্যে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি, এমন সময় রেস্তোরাঁরই একটি লোক এসে আমাকে ভেতরের দিকে নিয়ে গিয়ে একটা ভাল সিটেই বসিয়ে দিল।

যারা এসেছে সকলেরই পরণে বেশ দামী পোশাক, খাচ্ছেও দামী দামী খাবার, একোণে ওকোণে হাসির তুফান উঠছে। আমার তখন মনে হল টাকাই সব। নাঃ ঐ দশলাখের ভাগ ছেড়ে দেওয়া চলবে না। বড়লোক হতেই হবে, নইলে জীবন বৃথা।

বাড়ি ফিরে হিমতভাইয়ের নির্দেশ অনুসারে বেডরুমের পাশের দরজায়

চাবি খুলে ড্রেসিংরুমে অর্থাৎ আমার বর্তমান আস্তানায় ঢুকে পোশাক ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরলুম।

বেডরুম ও ড্রেসিংরুমের মাঝে যে দরজা ছিল সেটা শুধু ভেজানো ছিল। আমি সন্তর্পণে দরজায় কান পেতে শুনতে পেলুম হিমতভাই ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

ওপরে ওঠবার সময় লক্ষ্য করেছিলুম গ্যারাজে চন্দ্রার ক্যাডিলাক রয়েছে। এত তাড়াতাড়ি সে ফিরে এল কেন কে জানে। এত শীঘ্র বাড়ি ফিরলেও সে এখনও ঘুমিয়ে পড়ে নি। সে প্রচুর ম্যাগাজিন পড়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে হয়তো তাই পড়ছে। ওর সঙ্গে একটু গল্প করা যাক, ওকে একটু বাজিয়ে নেওয়া যাক। গতরাত্রে আমার সঙ্গে গালে গাল ঠেকিয়ে বুকে বুক চেপে নেচেছে, সে মেয়েকে আমি বশ করতে পারব।

বেডরুমের দরজা বন্ধ কিন্তু নব ঘোরাতেই খুলে গেল। ঘর ফাঁকা, চন্দ্রা ঘরে নেই, তবে বোঝা গেল সে বিছানায় কিছুক্ষণ অন্ততঃ শুয়ে ছিল। গায়ে দেবার চাদরটা পায়ের দিকে গোটানো, মাথার বালিস ছুটো স্বস্থানে নেই, বালিসের দুদিকেই কয়েকখানা পত্রিকা, হারপারর্স বাজার, ম্যাককল, সেভেনটিন এবং মনোহর কহানিয়া। একখানা প্লেবয় পত্রিকাও রয়েছে। এগুলো সে আমেরিকা থেকে আনায়।

খুট করে বাথরুমের দরজা খুলে গেল। বাথরুম থেকে চন্দ্রা বেরিয়ে এল। পরণে সালোয়ার কামিজ ধরনের পাতলা কাপড়ের একটা পোশাক, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আমার দিকে চেয়ে দেখল কিন্তু কিছু না বলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল। মুখের মেকআপ তুলতে বাথরুমে ঢুকেছিল। এখন আয়নার সামনে বসে চুলে চিরুনি বোলাতে লাগল।

ভেবেছিলুম হয়তো বলবে এত রাত্রে মহিলার বেডরুমে কি করছ কিন্তু সে কোনো কথাই বলছে না। আমি তখন বললুম, কি চন্দ্রলেখা কোনো কথাই বলছ না যে?

আমার নাম চন্দ্রলেখা নয়, চন্দ্রাদেবী। কিন্তু ও নাম ধরে আমাকে ডাকতে তো তোমাকে কেউ অধিকার দেয় নি।

অধিকার কি কেউ সহজে দেয়, আদায় করে নিতে হয়। আমি তো তোমাকে বলি নি আমার সঙ্গে গালে গাল ঠেকিয়ে, বুকে বুক

চেপে ধরে নাচতে, তার মানে তুমি আমার অন্তরঙ্গ হয়েছিলে। তাই নয় কি?

সে ত ইচ্ছে করে।

অনিচ্ছায় যে নয় তাতো আমি জানি, তোমার তো ভিন্ন মতলব ছিল। আমাকে ক্লাবে একা ফেলে রেখে একা বাড়িতে স্বামীকে খুন করার মতলব করেছিলে তুমি, যাতে আমি বাড়ি ফিরতে না পারি সেজন্যে আমার পকেট থেকে আমার পার্সটিও তুলে নিয়েছিলে।

স্বামীকে আমি মারতে যাব কেন?

একই উদ্দেশ্য, যখন তোমার নাম ছিল চন্দ্রলেখা, যখন তুমি কলগার্ল ছিলে। তখন কি মতলবে সাততলার জানালা থেকে অ্যান্টনি ডিসুজাকে ফেলে দিয়েছিলে?

তুমি কি সব বলছ বল ত? মদ খেয়েছ নাকি?

যা বলছি ঠিকই বলছি, তুমি কলগার্ল ছিলে না? তোমার নাম চন্দ্রলেখা ছিল না?

পকেট থেকে আমি তখন সেই ছবি দু'খানা বার করে আমার হাতে ধরে দেখালুম। ছবি দেখে চন্দ্রার মুখ সাদা হয়ে গেল কিন্তু তার নার্ভ খুব শক্ত। সামলে নিয়ে বলল, 'বেশ আমি কলগার্ল ছিলুম, চন্দ্রলেখা ছিলুম, কিন্তু তাতে কি হল?

তাতে এই হল যে তুমি অ্যান্টনিকে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে ধোঁকা দিয়ে লাখখানেক টাকা আদায় করেছিলে। তোমার স্বামী হিমতভাই শায়ের দশ লাখ টাকার জীবনবীমা আছে। তুমি তোমার স্বামীকে জীবনবীমার টাকার লোভে কাল খুন করতে চেয়েছিলে। সেই খবরটা আর তোমার আগেকার কেসহিস্ট্রিটা আমি বম্বে গিয়ে ইনসিওর কোম্পানিকে জানিয়ে দোবো মনে করছি। আর এই ছবি দু'খানাও কালই আমি তোমার স্বামীকে দেখাব?

চন্দ্রা আমার কথার কোনো জবাব দিল না। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে একখানা মোটা খাম বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, ও দুখানা কেন? এই খামে যত ছবি আছে সব কখানাই হিমতকে দেখাতে পার। আর বম্বে গিয়ে ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে আমার নামে কমপ্লেন করে কচু

করবে। সে কেস ত ফাইল হয়ে গেছে। অবিশ্যি এজন্যে ইনসিওরেন্স কোম্পানির এক বড় অফিসারকে আমার বুক ও পা কয়েকবার দেখাতে হয়েছিল। অতএব আমাকে ভয় দেখিয়ো না।

ভয় আমি না দেখালেও তোমার স্বামী তোমাকে ভয় দেখাবে। তিনি বম্বে গিয়েছিলেন জান না বোধহয়। তিনি গিয়েছিলেন অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস অফিসে, যাতে তুমি ইনসিওরের একটা টাকাও না পাও তার ব্যবস্থা করতে। কাল রাত্রে তুমি তাঁকে মাতাল মনে করে খুন করতে গিয়েছিলে কিন্তু তিনি মোটেই মাতাল হন নি, বেশ সজ্ঞানেই ছিলেন। তিনি তোমার মতলব ধরতেও পেরেছিলেন।

তাই নাকি? এসব তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলবেন? তা শ্রীমান অসিত চৌধুরী এসব কথা তুমি আমাকে না বলে পুলিসকে বলছ না কেন?

পুলিসকে বলছি না এই জন্যে যে আমি তোমার দলে। তোমার স্বামীর মৃত্যুর পর তুমি যে দশ লক্ষাধিক ইনসিওরেন্সের টাকা এবং তাঁর ঋণ শোধ করেও যে উদ্বৃত্ত টাকা থাকবে তার একটা মোটা অংশ আমার চাই। সৎপথে থেকে ত দেখলুম আমার কিছুই হল না। এখন অসৎপথে বিচরণ করে দেখা যাক। তাই আমার পরামর্শ তোমার স্বামী মদ খেয়ে খেয়ে এখন প্রায় মরণের দরজায় পৌঁছে গেছেন, তাই আমার পরামর্শ বাকি কটা দিন তাঁর একটু সেবাযত্ন কর। সহানুভূতি আদায় করে দেখ তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন কি না।

চন্দ্রা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তোমার কাছে যখন পরামর্শ চাওয়া হবে তখন দিয়ো, এখন বিদেয় হও।

কথা বলতে বলতে আমি খাম থেকে বার করে ছবিগুলো দেখছিলুম। এত দুঃসাহসিক ছবি আমি দেখি নি। আমার কান গরম হয়ে উঠছিল। কিন্তু আমিও ত মানুষ। একদিন চন্দ্রার দেহের কিছুটা সান্নিধ্য লাভ করেও ছিলুম।

আমার কথা শেষ হয়েছিল। ছবিগুলো আবার খামে ভর্তি করে সেখানা রেখে আমি সহসা দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রাকে জড়িয়ে ধরতে গেলুম। সে আমার গালে চড় মারতে এল। আমি সেজন্য প্রস্তুত ছিলুম। আমি ডান

হাত দিয়ে তার হাতটা ধরে ফেলে বাঁ হাত দিয়ে তার ঠোঁট থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে, ওকে জড়িয়ে ধরলুম। তারপর জোর করে ওকে চুম্বন করতে লাগলুম।

চন্দ্রা প্রথমে বাধা দেবার চেষ্টা করল, হাত পা ছুঁড়ল কিন্তু কতক্ষণ? তার দেহ অবশ হয়ে এল। আমাকেই সে চুম্বন করতে আরম্ভ করল এবং চন্দ্রাই আমাকে তার খাটের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

এই বলপ্রয়োগটুকু না ক'রে চন্দ্রার কোমল দেহ উপভোগ না করলে এত দ্রুত চন্দ্রাকে বশ মানানো যেত না। আমার মনে হল চন্দ্রা বুঝি সহজেই আমার বশীভূত হয়েছে কিন্তু ঘুম থেকে উঠে হাইতোলা আমাদের কাছে যেমন দৈনন্দিন ব্যাপার বা পিঠ চুলকে ক্ষণিক আরাম উপভোগ করা আমাদের কাছে যেমন অভ্যাসগত ব্যাপার তেমনি যৌনমিলন যে চন্দ্রার কাছে অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপার তা আমি অনুমান করতে পারি নি।

আমি বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর ওর পাশে শুতে না শুতেই চন্দ্রা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি সত্যিই ভাব যে ইনসিওরেন্সের টাকা পাবার আমার কোনো আশা নেই।

এত সুখের পর তোমার বুঝি এই কথাটাই মনে পড়ল?

ও সুখ আমার কাছে হাত পা চুলকানোর সামিল। আমার কাছে টাকাই সব, ঐ টাকাটা আমার হাতে এলে আমি অনেক কিছু করতে পারি।

আমাকে হিমতভাই বলেছেন যাতে তুমি ঐ জীবনবীমার একটাও পয়সা না পাও তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। আমার মনে হয় এজন্যই তিনি বম্বে গিয়েছিলেন।

কালই ওর শেষ দিন, কোম্পানির ডিরেক্টর থাকছে না। তারপরই পাওনাদাররা ওর ওপর শকুনির মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। হতচ্ছাড়াটা আর কি করবে? নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখবে আর রাতদিন মদ গিলবে। লিভারটা তো পচিয়ে ফেলেছে, এবার যে কোনো একদিন মরে ঘরের মধ্যে পড়ে থাকবে, ব্যাস্টার্ড।

তুমি তখন কি করবে?

আমি তখন এখানে থাকব নাকি? আমি কালই এখান থেকে কেটে পড়ব। আমার হাতে এখনও কিছু টাকা আছে, দিল্লি নয়তো ব্যাঙ্গালোর

যাব, এখনও অনেক মূর্খ বড়লোক আছে, তাদের কাউকে একটা পাকড়াব, আমার আর কি।

অত তাড়াহুড়ো কোরো না, দেখই না, কি হয়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আচ্ছা একটা সত্যি কথা বল ত? তুমি কি সত্যিই অ্যান্টনিকে জানলা দিয়ে ফেলে দাও নি?

না, কখনই না। ব্যাপারটা হয়েছিল কি আমি স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছিলুম। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি অ্যান্টনি সোফার ওপর উঠে জানলায় ওঠবার চেষ্টা করছে। ব্যবসায়ে ওর একটা দারুণ সংকট চলছিল। ওর হার্টও ভাল ছিল না, ও জানালা দিয়ে ঝাঁপ মেরেছিল মানে সুইসাইড করেছিল। আমি তখন উলঙ্গ তবুও ওকে ধরবার জন্যে জানলার ধারে গিয়েছিলুম কিন্তু ওকে আটকাতে পারিনি।

তবে তুমি নাকি ডাক্তার ডেকেছিলে এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দিয়েছিল যে ও লাফ মারবার আগেই ওর হার্ট ফেল করেছিল?

ডাক্তার আমি ডাকি নি, ওটা সাজানো ব্যাপার, ডাক্তারকে আমি হাত করেছিলুম। তবে লাফ মারবার আগে ওর হার্ট ফেল করে থাকতে পারে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি আমাকে সন্দেহ করেছিল কিন্তু আমি একজন বড় অফিসারকে হাত করেছিলুম। এই হল ব্যাপার।

এবার তোমার স্বামীর মৃত্যুর পর যদি জীবনবীমার টাকা দাবি কর তাহলে ইনসিওরেন্স কোম্পানি তোমাকে সহজে ছাড়বে না কারণ তোমার একটা কেস হিস্টরি আছে।

আমি ও টাকা দাবি করব না। আমি কালই চলে যাব, এখনও আমার রূপ যৌবন আছে, এখনও আমি পুরুষদের মাথা ঘোরাতে পারি।

অত তাড়াতাড়ি কোরো না। জীবনবীমার টাকা থেকে হিমতভাই যে সত্যিই তোমাকে বঞ্চিত করতে চায় তা ত আমার অনুমান, অবিশ্যি হিমতভাই আমাকে এ কথা বলেছে তবুও আমাদের হাতে এখনও কোনো প্রমাণ নেই তাই আমি বলি কি দু দিন অপেক্ষা কর।

ঠিক আছে, চন্দ্রা একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে।

আর যেতেই হয় ত দিল্লি বা ব্যাঙ্গালোর কেন? কোনো আরব দেশে চলে যাব, আমি তোমার এজেন্ট হয়ে কাজ করব।

চন্দ্রা উত্তর দেয় না। আমি উঠে পড়ি, বলি এবার যাই। রাত্রি অনেক হল, হিমতভাই আমাকে খুঁজতে পারে, আমাকে দেখতে না পেলে হয়তো এ ঘরে চলে আসবে।

সে হয়তো বাইরে কোনো ফাঁক দিয়ে আমাদের কীর্তিকলাপ দেখেও গেছে, ভীষণ ধূর্ত। যাক এবার তুমি যাও আমাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছ, সব শুনলুম কিন্তু তুমি এখনও ছেলেমানুষ, তোমার লেকচার শুনতে আমার আর ভাল লাগবে না। যাও, আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

ইচ্ছে হল ওর গালে ঠাস করে একটা চড় মারি। কিছু না বলে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

পরদিন হিমতভাই বেশ বেলা করে বেরোল। গাড়িতে উঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, বেতের বাসকেট নিয়েছ? বাকি ওয়াইন স্টলগুলো নিতে হবে। আজই আমার শেষ দিন। শেষ রাত্রিও বলতে পার।

দুটো বাসকেট সঙ্গে নিয়েছি স্যার কিন্তু আপনি কি বললেন, শেষ রাত্রি যেন কি?

হোয়াটস নট ইয়োর হেডএক, লাঞ্চ করেছ?

না স্যার আপনাকে অফিসে পৌঁছে দিয়ে তবে ত রোজ লাঞ্চ করি।

বেশ তাহলে হ্যাভমোর রেস্তঁরায় চল, ওখানেই লাঞ্চ করব।

হিমতভাই লাঞ্চ খেলেন অতি সামান্যই। স্যুপ, স্যালাডসহ চিকেন কাটলেট, পুডিং আর কফি।

অফিসে পৌঁছে দেবার পর বললেন, ঠিক চারটেয় এস। বেতের বাসকেট দুটো রেখে যাও।

চারটের সময় হিমতভাইকে আনতে গিয়ে দেখলুম তাঁর চেম্বারে কোনো ফার্নিচার নেই। তিনি একটা সাধারণ গদি আঁটা চেয়ারে বসে আছেন। সামনে বেতের বাসকেট দুটো। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলুম না। এরা যেন হিমতভাইকে তাড়াতে পারলে বাঁচে।

এসে গেছ অসিত? গুড। চল। বাসকেট দুটো নিতে পারবে ত?

খুব পারব স্যার। আমি বাসকেট দুটো তুলে নিলুম। ধারে কাছে একটা লোককেও দেখা গেল না অথচ সমস্ত অফিসটা গমগম করছে।

হিমতভাইকে ফেয়ারওয়েল জানাতে একটা লোকও এল না। হিমতভাই গাড়িতে উঠে বসলেন।

আমি গাড়িতে উঠতে যাব এমন সময় আমাদের গাড়ির ঠিক পিছনে একখানা মার্সিডিস গাড়ি এসে থামল। স্টিয়ারিং হুইলে সুবেশ একজন প্রবীণ ব্যক্তি বসে আছেন। তাঁর পাশ থেকে একজন সুন্দরী ও সুবেশা মহিলা দরজা খুলে নেমে এসে আমাদের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে হিমতভাইকে বললেন।

আমি খবর পেয়ে আমেদাবাদ থেকে ছুটে আসছি দাদা, আমি সব শুনেছি, সব জানি, তুমি আমার বাড়ি চল, তোমার জন্যে আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি, তোমার একটুও অসুবিধে হবে না।

কথা বলতে বলতে মহিলা দরজা খুলে গাড়িতে উঠে হিমতভাইয়ের পাশে বসে নিজের দুহাত দিয়ে হিমতভাইয়ের একটি হাত ধরে বললেন— তুমি আমার জন্যে অনেক করেছ দাদা, আজ আমি যে স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে আছি সে তোমারই জন্যে। তুমি আমার বাড়ি চল দাদা। মহিলা অনেক অনুরোধ করলেন। গাড়ি থেকে তাঁর স্বামীও নেমে এলেন। অনেক বোঝালেন, শেষ পর্যন্ত বললেন অন্ততঃ একটা মাস থেকে আসবেন চলুন। মহিলার চোখে তখন জল এসে গেছে।

হিমতভাই কিছুতে যাবেন না। শেষমেষ একটা সুযোগ পেয়ে বললেন, দেখ রঞ্জিতা, আজ রাত্রে আমার একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে। কাজটার সাফল্যের ওপর আমার বাকি জীবন নির্ভর করছে, আশা করছি কাজটা আমি সুষ্ঠুভাবেই শেষ করতে পারব। এইজন্যে আমি এখান থেকে এবং আজই সরাসরি তোমার সঙ্গে যেতে পারছি না। এবার বুঝলে তো?

রঞ্জিতা রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল ঠিক আছে দাদা, আমি কাল আসতে পারব না।- তবে সোমবার দুপুরে আসব, তুমি সব গুছিয়ে রেখো। তাহলে এখন আসি দাদা, আমার কথা কিন্তু রাখতে হবে, ফিরিয়ে দিলে খুব কষ্ট পাব।

ওঁরা গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। হিমতভাই আমাকে যেতে বললেন। বাড়ি ফেরার পথে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন। চিনতে পারলে?

আপনার বোন তো স্যার।

না, ওর আসল নাম রঞ্জিতা হলেও ওর ফিলমী নাম বললে চিনতে পারবে। ওর নাম ছিল শুভা পারেখ, দশ বছর আগে ও ছিল হিন্দী, মারাঠী আর গুজরাটী ছবির টপ র‍্যাংকিং স্টার। আমিই ওকে স্টার করেছিলুম কিন্তু মেয়েটি বড় ভাল ছিল। ওর ব্যাংকে যেই দশ লাখ টাকা জমল আমি ওকে ফিল্‌ম লাইন থেকে সরিয়ে দিয়ে আমেদাবাদের একটি ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ে দিলুম।

হিন্দি ছবি আমি বেশি না দেখলেও শুভা পারেখের নাম শুনেছি এবং সিনেমা পাত্রিকায় ওর প্রচুর ছবিও দেখেছি। সাহেব কিন্তু আর কিছু বললেন না। হঠাৎ গম্ভার হয়ে গেলেন। আর একটিও কথা বললেন না।

রঞ্জিতা গাড়ি থেকে নেমে যাবার আগে হিমতভাইয়ের হাতে এক কৌটো কিছু খাবার দিয়ে গিয়েছিল। বাড়ি পৌঁছে হিমতভাই সেই কৌটোটি হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আমাকে বললেন বোতলগুলো ওপরে নিয়ে চল। কাবার্ডের ওপর কাল যেখানে বোতলগুলো রেখেছিলে এই বোতলগুলোও তারই পাশে সাজিয়ে রাখ।

বোতলভর্তি বেতের বাস্কেটগুলো নিয়ে আমি ওপরে উঠলুম। তিরিশটা বোতল আমি কাবার্ডের ওপর সাজিয়ে রাখলুম, তিনি দাঁড়িয়ে দেখলেন। বোতলগুলির দিকে হিমতভাই এমনভাবে চেয়ে রইলেন যেন এগুলি তাঁর সন্তান।

বোতল সাজান শেষ হতেই তিনি বললেন, অসিত তোমাকে এখনি একটা জরুরী কাজ করতে হবে।

ভেতরের পকেটে হাত দিয়ে তিনি খামেভরা একখানা চিঠি বার করলেন। বললেন, চিঠিখানা জরুরী। বরোদায় আর এম এস-এ আমি নিজেই এখানা ডাকে দিতুম কিন্তু রঞ্জিতা এসে পড়ায় আমি ভুলে গেছি। তুমি গাড়ি নিয়ে এখনি আবার বরোদা ফিরে যাও, চিঠিখানা খুব জরুরী, আর এম এস ছাড়া আর কোথাও পোস্ট করবে না।

আমি প্রস্তাব করলুম, ছানি পোস্ট অফিস থেকে ক্লিয়ারেন্স হয়, এখনও পনেরো মিনিট বাকি আছে। ওখানে পোস্ট করে দোবো?

হিমতভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, তাহলে আমি তাই বলতুম, তুমি যদি বরোদা যেতে না পার ত আমি নিজেই যাচ্ছি।

তা নয় স্যার, আমিই যাচ্ছি, আমি দেখেছি কি না যে ছটার, মেল ভ্যান এসে এখান থেকে চিঠি নিয়ে যায়, তাই আ। বলেছিলুম। ঠিক আছে স্যার আমি এখনি যাচ্ছি।

হিমতভাইয়ের হাত থেকে আমি চিঠিখানা নিযে আমার সার্টের ভেতরের পকেটে রাখলুম। খামের ওপরে ঠিকানা লেখা ছিল : রোহিত মেটা, মেটা অ্যাণ্ড দেশাই, সলিসিটার্স, জি / ১২৯ ফিরোজশা মেটা রোড, অষ্টম তল, বম্বে-৪০০০০১।

নিচে নেমে গাড়িতে উঠে বসলুম। মেজাজটা খারাপ ছিল। গাড়িটার একটা বলবেয়ারিং লুজ হয়ে গিয়েছিল। বরোদায় পৌঁছে বাস-স্টেশনের কাছে একটা সারভিস স্টেশনে বেয়ারিংটা আগে ঠিক করিয়ে নিলুম। রোজই ভুলে যাই, কর্তাও বিরক্ত হন। তাই ঐ কাজটা আগে সেরে নিলুম।

ক্ষিধে পেয়েছিল। গুজরাটে এসে পর্যন্ত এখানকার বিখ্যাত শ্রীখণ্ড খাওয়া হয় নি। স্টেশনের ভেতরে বরোদা ডেয়ারির স্টলে শ্রীখণ্ড পাওয়া যায়। ভাবলুম স্টেশনে যখন এসেইছি তখন আগে শ্রীখণ্ড খেয়ে নিই, ফেরবার পথে আর এম এস-এ চিঠিখানা পোস্ট করে দেবো। পাশেই তো আর এম এস। কিন্তু সেদিন আমি চিঠি পোস্ট করতে ভুলেই গেলুম। কোন বিষয়ে মনে মনে অনিচ্ছা থাকলে সে কাজ ভুল হয়। চিঠি ডাকে দেবার জন্য আমার বরোদা আসতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না, সেইজন্যে চিঠি পোস্ট করতে ভুলেই গেলুম।

ছানিতে গ্রীনপার্কে ফিরে আমি আমার গ্যারেজ ঘরে ঢুকে স্নান করে একটু ঘুমিয়ে নিলুম। ঘুম ভাঙল সাড়ে সাতটায়। ঘুম থেকে উঠে জামা প্যান্ট পরে ফিটফাট হয়ে আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে আমি হিমতভাইয়ের ঘরের উদ্দেশে বেরলুম। মুখের সিগারেট যখন শেষ করলুম ক্লকটাওয়ারের ঘড়িতে তখন আটটা বাজল। আমি হিমতভাইয়ের দরজায় টোকা মারলুম। কারণ ঠিক আটটার সময় তিনি আমাকে তাঁর ঘরে যেতে বলেছিলেন।

কে অসিত? ভেতরে এস, তিনি বললেন।

দরজা খুলে আমি ভেতরে গেলুম। দেখলুম তিনি রাইটিং টেবিলের সামনে বসে রয়েছেন। টেবিলের ওপর স্কচ হুইস্কির একটা বোতল, পাশে

একটা গ্লাসেও খানিকটা হুইস্কি রয়েছে। অ্যাশ-ট্রে উপচে পড়ছে। কপালে ঘামের বিন্দু, চোখ চকচক করছে।

ঐ চেয়ারটায় বোসো। চিঠিখানা ডাকে দিয়েছ তো ?

আমি বেমালুম মিথ্যা কথা বললুম, সে তো অনেকক্ষণ স্যার, চিঠি পোস্ট করে আমি সাড়ে ছটার মধ্যেই ফিরে এসেছি।

থ্যাংক ইউ, স্মোক করবে, ড্রিংক করবে ?

না স্যার, ও সব অভ্যাস আমার নেই।

বেঁচে গেছ, বলতে বলতে তিনি গেলাসে বেশ লম্বা একটা চুমুক দিয়ে গেলাস নামিয়ে রেখে বললেন, তোমাকে কেন আসতে বলেছি জান ? আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি কিছু কথা বলব, আমি তোমাকে স্বাক্ষী রাখতে চাই, কথাগুলো মন দিয়ে শুনো, কারণ পরে তোমাকে হয়তো কোর্টে সাক্ষী দিতে হবে।

তাহলে কি স্যার একটা টেপরেকর্ডার নিয়ে আসব ?

তার দরকার নেই, তুমি খালি চুপ করে কথাগুলো শুনে যাবে, কিছু মন্তব্য করবে না।

তিনি নিজেই চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে চন্দ্রাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে চন্দ্রাকে বসতে বললেন।

চন্দ্রা চেয়ারে বসবার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে হিমতভাইকে বললেন, তুমি তো বললে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। তা ও এখানে কি করছে ?

চন্দ্রা আমিই ওকে আসতে বলেছি। তোমার সঙ্গে আমার যে সব কথা হবে তাতে আমি ওকে সাক্ষী রাখতে চাই। ও কিছু বলবে না বা করবে না, শুধু নীরব শ্রোতা। সিগারেট খাবে তো খাও।

চন্দ্রা, কিছু না বলে একটা সিগারেট ধরাল। আমি লক্ষ্য করলুম হিমতভাই স্ত্রীর দিকে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে কিন্তু চোখমুখ থেকে ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে।

চন্দ্রা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর হিমতভাইকে বলল, কি বলবে বল। স্বরে বেশ ঝাঁঝ।

তোমাকে বেশিক্ষণ আটকাব না চন্দ্রা, আগে ব্যাগগ্রাউণ্ড মানে পশ্চাৎপটটা এই ছোকরাকে একটু বলে নিই, একটু ধৈর্য ধর, ড্রিংক করবে ?

চন্দ্রার উত্তরের আশা না করে হিমতভাই আমাকে বললেন, অসিত আমার সামনে এই যে অপূর্ব সুন্দরীকে দেখছ এর নাম চন্দ্রা, এর চরিত্র ও সমস্ত পাপকার্য জেনেই আমি একে দেড় বছর আগে বিয়ে করেছিলুম। ভেবেছিলুম এত রূপ যে মেয়ের সে মেয়ে কখনও অসচ্চরিত্র হতে পারে না, যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে সঙ্গদোষে হয়েছে, আমি ওকে ভালবাসা দিয়ে সংশোধন করে নিতে পারব। কিন্তু জানতুম না যে চন্দ্রা ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

এক চুমুক হুইস্কি পান পরে হিমতভাই আবার আরম্ভ করলেন। আমি ব্যবসাদার মানুষ, প্রচুর ভ্রমণ করতে হয়, মোটরে, ট্রেনে, প্লেনে অনেক সময় টেনসানে ভুগতে হয়, রক্তচাপ বেড়ে যায়। আমার হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় সেইজন্যে ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ আমি চন্দ্রার জন্যে দশ লাখ টাকার একটা ইনসিওরেন্স করে দিলুম। যেই প্রিমিয়ম জমাপড়ল, পলিসি হাতে এসে গেল আর অমনি চন্দ্রার চরিত্রও সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল। সে আমাকে জীবিত অপেক্ষা মৃত দেখতে চাইল। চন্দ্রা আমাকে তিনবার মারবার বৃথা চেষ্টা করেছিল, একবার তো তুমি নিজেও দেখেছ, কি বল অসিত?

আমি কোনো উত্তর দিই না, চুপ করে থাকি। হিমতভাই তো আমাকে বলেই দিয়েছিলেন তুমি শুধু শুনে যাবে, কোনো মন্তব্য করবে না।

চন্দ্রা কিন্তু ঝাঁঝিয়ে ওঠে। সে বলে, মাতালের এসব মাতলামো শোনবার আমার সময় নেই, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি চললুম।

দয়া করে আর একটু অপেক্ষা কর চন্দ্রা, তোমাকে আমি আর কখনও কোনো অনুরোধ করব না, আমার অতি প্রয়োজনীয় এবং শেষ কথা এখনও বলা হয় নি।

হিমতভাই এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্য একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে চন্দ্রার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটুকু খেয়ে নাও কারণ শীঘ্র তোমাকে······যাক আস্তে আস্তেই বলি। ওটুকু খেয়ে নাও। তারপর এই মহিলা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করতে লাগলেন যে তিনমাসের মধ্যে আমি বোতলের এমনই দাস হয়ে পড়লুম যে আমি আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেললুম, দু হাতে পয়সা ওড়াতে আরম্ভ করলুম, ব্যবসা জগতে আমার দুর্নাম রটতে লাগল, নীতি নির্ধারণে পদে পদে ভুল করতে লাগলুম,

এবং অচিরে আমার পতন হল। আমার পদ, আমার মানসম্মান ও মর্যাদা সবই হারালুম এবং আমি ঋণে আকণ্ঠ ডুবে গেলুম। আর ওদিকে চন্দ্রা তখন আমাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করছে এবং বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রা তো আসলে মূর্খ। ও জানে আমি আমার বালিসের তলায় আমার রিভলভার রেখে শুই। মদ খেয়ে কতদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি। ও যদি আমার বালিশের তলা থেকে আমার রিভলভারটা বার করে আমার মাথায় গুলি করে নিজের আঙুলের ছাপ মুছে আমার লাশের পাশে রিভলভারটা ফেলে রাখত তাহলে পুলিস, ইনসিওরেন্স কোম্পানি এবং জগৎশুদ্ধ মানুষ বিশ্বাস করত যে মাতাল হিমতভাইটা সুইসাইড করেছে কারণ সুইসাইড করার অনেক কারণ ছিল।

বাঃ বেশ বললে ত হিমত, তুমি সুইসাইড করলে আমি কি করে ইনসিওরেন্সের টাকা পেতুম? চন্দ্রা নির্লজ্জভাবে বলল।

ঐ জন্যেই ত বললুম তুমি মূর্খ। ইনসিওরেন্স পলিসিখানা তোমাকে পড়তে দিয়েছিলুম, তাতে শর্তই আছে যে স্বাভাবিক মৃত্যু বা দুর্ঘটনা ঘটলে তো বটেই, এমন কি আমি যদি সুইসাইডও করি তাহলেও তুমি টাকা পাবে। কিন্তু হায় মূর্খ নারী তুমি আর সে সুযোগ পাবে না কারণ আমি বম্বে গিয়ে আমার অ্যাটর্নি মারফত আমি ঐ সুইসাইড শর্তটি বাতিল করিয়ে এসেছি অর্থাৎ আমি সুইসাইড করলে তুমি টাকা পাবে না এবং পলিসি থেকে তোমার নামটাই বাদ দেওয়া হয়েছে, আমি মরলে তুমি একটি পয়সাও পাবে না এবং তোমার নামে যে বাড়িখানা আমি উইল করেছিলুম সে উইলও আমি বাতিল করে দিয়েছি।

গেলাসের হুইস্কিটুকু চন্দ্রার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে এবার নিজেই বোতল থেকে আর একটু হুইস্কি গেলাসে ঢেলে নিল।

হিমতভাই বলল, এরপরও চন্দ্রা তুমি কোনোরকম চালাকি করবার চেষ্টা কোরো না। যে বিদেশী ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে আমার ইনসিওর করা আছে তাদের একজন প্রতিনিধি অ্যামেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানিতে আছে। ইনসিওরেন্স জগতে সে একজন দুঁদে লোকরূপে পরিচিত, অত্যন্ত চতুর, জাল ইনসিওরেন্স ধরতে সে ওস্তাদ, নাম তুমি শুনেছ বোধ হয়, সেলিম আলি। তাকে আমি সব জানিয়ে এসেছি, খুব সাবধান সে কমসে

কম সতেরো জনকে জেলে পাঠিয়েছে আর তিন জনের তো ফাঁসিই হয়েছে। সেলিম যদি ডিটেকটিভ হতো তাহলে পৃথিবীজোড়া নাম করত।

চন্দ্রা পরেছিল সেই চানিয়া ও একটা ছোট ব্লাউস। ব্লাউসের নিচে ব্রা পরার প্রয়োজন ছিল না। প্রথমে সে চানিয়ার কোমরের দড়ি আলগা করল তরপর ব্লাউসের সবকটা বোতাম খুলে দিল।

ওকি চন্দ্রা ও কি করছ, তুমি কি জামা খুলে ফেলবে নাকি? আমার কথাগুলো হজম করতে পারছ না বুঝি? বড় গরম?

বেশ করছি, আমার ইচ্ছে হয় আমি সব খুলে ফেলব।

যা ইচ্ছে হয় কর কিন্তু শোনো চন্দ্রা আমি প্রতিহিংসা নেবো। আমি পুলিশকে বা কাউকে তোমার নামে অভিযোগ করব না। কিন্তু এমন কাজ করে যাব যে বাকি জীবন তোমাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবুও আমি বলছি যে তুমি যদি একটু বুদ্ধি খাটাও তাহলেও বোধহয় ইনসিওরের টাকা পেলেও পেতে পার। আমি খুন হলেও তুমি টাকা পাবে।

চন্দ্রা গা থেকে তার ব্লাউস খুলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। হিমতভাইয়ের কথা শুনতে লাগল। আমিও একটু নড়েচড়ে বসলুম।

হিমতভাই মদ্যপান বন্ধ করেছিলেন। গেলাসের সুরাটুকু শেষ হয়ে গিয়েছিল। খালি গেলাসটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বলতে লাগলেন, আমার কোম্পানির সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক মিটে গেছে, আমি এখন একটা জিরো, ভিখিরি, কাল থেকেই পাওনাদাররা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার পক্ষে এখন বেঁচে থাকা অসম্ভব তাই আমি ঠিক করেছি আর কিছুক্ষণ পরে এই ঘরের মধ্যেই আমি সুইসাইড করব।

ভুরু কুঁচকে ব্লাউসের বোতাম নাড়তে নাড়তে চন্দ্রা বলল, তোমার মাথাটা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে?

মোটেই খারাপ হয়নি। সুইসাইড তো করবই, ভয় পেয়ো না, মরবার আগে অ্যাসিড ঢেলে তোমার মুখটা আমি বিকৃত করে দোবো না। তবে তুমি যদি চালাক হও তাহলে আমার সুইসাইড তুমি খুন বলে সাজিয়ে এখনও টাকা দাবি করতে পার কিন্তু সে বুদ্ধি তোমার নেই, অথচ কাজটা সহজ এবং তোমাকে তা বলব না।

আমি মনে মনে ভাবছি হিমতভাই কি পাগল হয়ে গেল নাকি ? সে এসব কি বলছে ?

হিমতভাই চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন—তোমার জন্য আমার দুঃখ হয় চন্দ্রা। ভাল হয়ে থাকলে তুমি দশ লাখ আর একটা মাত্র বাড়ি কেন, তুমি অনেক অনেক টাকার মালিক হতে পারতে কিন্তু তোমাকে এখন ভিক্ষে করতে হবে।

আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, আমার রূপ আছে, রূপের আগুনে এখনও অনেককে পোড়াব।

চন্দ্রা উঠে দাঁড়াল, বলল, আমি চললুম, তোমার যা ইচ্ছে কর। আমি জানি তোমার আত্মহত্যা করার সাহস নেই। কথা কটা ছুঁড়ে দিয়েই চন্দ্রা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। লোকটা আমার সামনেই সুইসাইড করবে নাকি ? আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, তাহলে আমিও যাই স্যার, আমাকে বোধহয় আপনার আর দরকার নেই। আজ আমি আমার গ্যারাজ ঘরেই শুতে যাচ্ছি।

হিমতভাইয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলুম। আমি যখন আমার ঘরের দরজায় পৌঁছেছি তখনই রিভলভারের আওয়াজটা শুনলুম। নির্জন বাড়িটা যেন কেঁপে উঠল, সেই সঙ্গে আমিও।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে চন্দ্রার ঘরের দিকে গেলুম।

চন্দ্রা পাথরের মূর্তির মতো নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। উলঙ্গ। বোধহয়, ব্লাউস ও চানিয়া ছেড়ে নাইটি পরতে যাচ্ছিল।

আমাকে দেখে বলল, ঘরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে এস।

ঘরে ঢুকে দেখি হিমতভাই যে টেবিলে বসে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল সেই টেবিলের সামনে সেই চেয়ারে বসেই। মাথায় তার সেই '৩৮ বোরের অটোম্যাটিক রিভলভারের নল ঠেকিয়ে গুলি করেছে।

ইতিমধ্যে একটা হাউস কোট পরে চন্দ্রাও ঘরের দরজার সামনে এসে

দাঁড়িয়েছে। হিমতভাইকে দেখেই বোঝা গেল সে মরেছে, কব্জি স্পর্শ করে নাড়ী পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলুম, নাকি দারুণ একটা উত্তেজনা তা ঠিক বুঝতে পারছিলুম না। বুক ঢিব ঢিব করছিল। ভয় বা উত্তেজনা যাই হয়ে থাকুক চন্দ্রার প্রতি হিমতভাইয়ের সেই কথাগুলো আমার মনে পড়েছিল, একটু বুদ্ধি খাটালে আমার আত্মহত্যাটা তুমি খুন বলে চালিয়ে দিয়ে দশ লাখ টাকা দাবি করতে পার। কিন্তু কি করে আত্মহত্যাটা খুন বলে চালাবে সেটা আমি বলব না।

হিমতভাইয়ের এই আত্মহত্যা কি করে খুন বলে চালাব সে বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছিল এবং সেইভাবে কাজ করব কিনা এবং সেই কাজে চন্দ্রার সম্মতি পাব কিনা আমি চিন্তা করছিলুম। সেই কথা চিন্তা করে আমি উত্তেজিত হয়ে থাকতে পারি।

চন্দ্রা আর ঘরে ঢুকল না। দরজার কাছ থেকে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, মরেছে?

হ্যাঁ মারা গেছে।

মাতাল, পাগল, শয়তান! আমি ভেবেছিলুম সুইসাইড করবার সাহস হবে না, আমাকে আরও জ্বালাবে। চন্দ্রা আর কোনো কথা বলল না, ঘরে ঢুকে হিমতভাইকে একবার দেখলও না। নিজের ঘরে ফিরে গেল।

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। ঘাম মোছবার জন্যে রুমাল বারকরবার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখি অ্যাটর্নিকে লেখা হিমতভাইয়ের সেই চিঠি, যে চিঠি আমাকে ডাকে দিতে বলেছিল এবং আমি ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলুম।

খামখানা আমি পকেট থেকে বার করে খুব সতর্কতার সঙ্গে সেটা খুলে চিঠিখানা বার করে পড়লুম। হিমতভাই তার অ্যাটর্নি এবং বন্ধু রোহিত মেটাকে লিখছে:

মাই ডিয়ার রোহিত, তুমি যখন আমার চিঠি পাবে তখন আমি পরলোকে। খবরের কাগজের লোকেরাও আমাকে ভুলে না থাকলে ইতিমধ্যে খবরের কাগজেও পড়ে থাকতে পার। আমি তো তোমাকে সেদিন

বলেই এসেছিলুম আমি সুইসাইড করব, এছাড়া আমার আর পথ নেই। এবং কেন সুইসাইড করলুম তাও তুমি ভাল করে জান।

আমার পতনের কারণ চন্দ্রা। তাকে আমি একটু শাস্তি দিতে চাই। তার জন্যে আমি একটি পয়সাও রেখে যাচ্ছি না। এমন কি আমার জীবন-বীমার পলিসি থেকে 'আত্মহত্যা' শর্তটাও বাদ দিয়েছি তাও তুমি জান।

যাইহোক রূপসীর রূপের আড়ালে একটা শয়তান আছে। সেই শয়তান আমার আত্মহত্যা খুন বলে চালিয়ে জীবনবীমার টাকা দাবি করতে পারে। তবে এ কাজ সে একা করতে পারবে না। আমি তোমাকে আমার শফার-কাম-সেক্রেটারি অসিত চৌধুরীর কথা বলেছি। চন্দ্রা তার সাহায্য নিতে পারে। অসিত সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি সুইসাইড করব একথা আমি অসিতের সামনে চন্দ্রাকে বলে যাব। চন্দ্রা যদি অসিতকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে তাহলে তুমি আমার এই চিঠি পুলিসকে দেখাবে, এই আমার অনুরোধ।

চন্দ্রার কি হবে না হবে সেজন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তবে সে নিশ্চিত আমার মত তার একটা মূর্খকে পাকড়াও করে তাকে শুষে খাবার চেষ্টা করবে।

তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো। ইতি

হিমতভাই শা

চন্দ্রা যে আবার কখন ঘরের দরজায় ফিরে এসেছে তা আমি লক্ষ্য করি নি। সিগারেটের গন্ধ পেয়ে টের পেলুম। চিঠিখানা পড়ে আমি মনে মনে পুলকিত হলুম। চিঠিখানা আমি তখন পকেটে ভরছিলুম। চন্দ্রা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি পড়ছিলে?

আমি যেন তার কথা শুনতে পাই নি। আমি তার কথার কোনো উত্তর দিলুম না।

চন্দ্রা বলল, এখনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার, পুলিসকেও খবর দেওয়া দরকার। আমি টেলিফোন করি?

আমি বললুম, আমাকে একটু ভাবতে দাও। উনি যে আত্মহত্যা করলেন সে কথা লিখে রেখে যান নি। পুলিস বিশ্বাস নাও করতে পারে। ওঁর রিভলভারে কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে কে বলতে পারে? না পাওয়া গেলে পুলিস আমাদের সন্দেহ করবে।

কিন্তু অসিত পুলিসকে তো জানাতেই হবে…।

আমি তখন ভেবে ফেলেছি যে হিমতভাইয়ের রিভলভারটা যদি লুকিয়ে ফেলি তাহলে এটা খুন বলে প্রমাণ করা সহজ হবে এবং সে ক্ষেত্রে চন্দ্রা ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে টাকাও দাবি করতে পারবে। আর আমার নিজের রক্ষা কবচ তো আমার পকেটেই রয়েছে, রোহিত মেটাকে লেখা হিমতভাই শায়ের চিঠি।

আমি চন্দ্রাকে বললুম অত ব্যস্ত হোয়ো না। পুলিস আমাদের ছাড়বে না। ডাক্তার এসে বলবে ঠিক কোন সময়ে হিমতভাই মরেছে এবং তখন আমরা দুজনেই বাড়ি ছিলুম। পুলিস এটাকে ষড়যন্ত্রও বলতে পারে অথচ আমরা যদি এটা খুন বলে চালাতে পারি তাহলে আমরা ইনসিওরের দশ লাখ টাকা দাবি করতেও পারি। অনেক কিছু দরকার ও ভাববার আছে। আমরা পুলিসকে বলতে ও প্রমাণ করতে পারি যে হিমতভাই মারা যাবার সময় আমরা এই বাড়িতেই ছিলুম না এবং সেই সুযোগে হিমতভাইয়ের কোনো পাওনাদার বা শত্রু তাকে হত্যা করেছে। তাহলে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। ভেবে দেখ চন্দ্রা।

এক হাজার দু হাজার নয়, দশ লাখ! লোভ সামলানো কঠিন। চন্দ্রার মুখ উজ্জ্বল হল। সে তার ঘরে আবার ফিরে গেল। আমি হিমতভাইয়ের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম এখন আমাকে ধাপে ধাপে কি কাজ করতে হবে।

পরে আমি ভেবেছিলুম, ইস্ একটা টেপরেকর্ডার যদি লুকিয়ে রাখতুম আর সেই সঙ্গে রিভলভারটা লুকিয়ে রেখে রোহিত মেটার চিঠিখানা সেই রাত্রেই ডাকে দিয়ে দিতুম? তাহলে…। কিন্তু আমি তা করলুম না। আমি যা করলুম তাতে এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগল।

চন্দ্রার ঘরে ঢুকে দেখি সে নাইটল্যাম্প ছাড়া সব আলো নিবিয়ে দিয়ে মাথার দিকে অনেকগুলো বালিস জড়ো করে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টানছে। হাউসকোটের বুকের দুটো বোতাম খোলা আর ওদিকে হাঁটুর নিচে নেমে গেছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, এতক্ষণ মুখপোড়াটার ঘরে কি করছিলে।

চন্দ্রার এত ঘৃণা কেন ? কণ্ঠস্বরে এত শ্লেষই বা কেন ? তার স্বামী তার তো কোনো ক্ষতি করতে চায় নি। যা ঘটল তার জন্যে তো সে নিজেই দায়ী। আমি তার দিকে যেভাবে চাইলুম তাতে সে বুঝল এখন ঝগড়া বা তর্কাতর্কি করবার সময় নয়।

আমি খাটের একপাশে বসে ওর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বললুম, তোমার স্বামীর একটা কথা মনে আছে ? সে বলেছিল তুমি যদি আমার আত্মহত্যাটা হত্যা বলে চালাতে পার তাহলে টাকাটা পেয়ে যেতে পার। আমি এতক্ষণ সেই ব্যবস্থাই করছিলুম।

কি সব পাগলের মতো বকছ অসিত, এসব কাজ খুব বিপজ্জনক, পুলিস ঠিক বার করবে। পুলিসকে তুমি চেন না। মুখপোড়াটা আমার জন্যে ফাঁদ পেতে গেছে, আত্মহত্যা নয় প্রমাণ করতে গিয়ে হত্যাকারী প্রমাণিত হয়ে যাব। যদিও ওর রিভলভারটা গায়েব করে দিই তাহলে পুলিশ আমাকেই মার্ডারেস বলে সন্দেহ করবে কারণ আমার একটা মোটিভ তারা বার করবে, ঐ সর্বনেশে দশ লক্ষ টাকা, বাড়িতে তখন আমরা ছাড়া আর কেউ ছিলও না। ও পথে যেয়ে কাজ নেই।

আমি সেসব ভেবেছি চন্দ্রা। কম টাকা নয়, দশ লক্ষ টাকা। তবে আমাকে অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ দিতেই হবে।

তুমি কি করেছ ? তোমার মতলব কি ?

আমার প্রথম মতলব হল পুলিসের চোখে ধুলো দেওয়া। খুন এ বাড়িতেই হয় নি এবং খুনের সময় আমরা দুজনেই এবাড়িতে ছিলুম না। আমি হয়তো ছিলুম কিন্তু তুমি বা হিমতভাই এখানে ছিলে না। তুমি হিমতভাইকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলে, পথে তোমাদের কোনো শত্রু তোমাদের গাড়ি আটক করে। তোমার হাত পা মুখ বেঁধে একটা নির্জন বাড়িতে ফেলে রেখে হিমতভাইকে খুন করে রাস্তায় বা কোনো বাড়িতে ফেলে রেখে গিয়েছিল, আমি তারই ব্যবস্থা করেছি।

দেখ অসিত প্রথম দিন তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল তুমি বোকা, এখন দেখছি তুমি একটি আস্ত গাড়ল, তুমি যা বলছ ওসব ডিটেকটিভ বইতে পড়তে বেশ রোমাঞ্চ লাগে কিন্তু বাস্তব জীবনে ঘটে না।

আমি অত সহজে পাঁচ লাখ টাকা ছেড়ে দেবো না, তাছাড়া তোমাকেও

াামি ছাড়ছি না, তোমার দেহের ওপর আমার প্রচুর লোভ। আমি হিমতভাইয়ের বডি কিচেনে ডিপফ্রিজ ক্যাবিনেটের মধ্যে ভরে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অর্থাৎ হার্টের কাজ থেমে যাওয়ার ফলে টেবিলের ওপরে বড় ব্লটারটার ওপর বেশি রক্ত পড়েনি। আমি সে ব্লটার পুড়িয়ে দিয়েছি, ভাইয়ের চিহ্নও রাখি নি। ডিপফ্রিজে থাকার ফলে লাশ পচবে না যাকে বলে রিগর মরটিস তারও লক্ষণ দেখা দেবে না। তারপর আমরা যেদিন সুবিধে মতো লাস বার করব সেদিন দেহ থেকে রক্ত বেরোতে আরম্ভ করবে, রিগর মরটিসও আরম্ভ হবে। এই হল আমার প্ল্যান।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আমি বললুম, তবে পুলিস ও ইনসিওর কোম্পানির ঝামেলা পোয়াতে হবে। সেসব আমি করব। আমিতো হিমতভাইয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি ডিপফ্রিজ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে।

কিন্তু আমি এখন থাকব কোথায়?

তুমি এই বাড়িতেই থাকবে। তোমার স্বামী হঠাৎ কোথাও চলে গেছে। আমরা আরও একটা কাজ করতে পারি। কযেক দিন পরে ডিপফ্রিজ থেকে ওর লাস বার করে কোথাও রেখে আসব, সেই সঙ্গে তার রিভলভারটা। ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে জানিযে দোবো হিমতভাই সুইসাইড করেছে। ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে তাহলে আর টাকা দিতে হবে না। তুমিও কোনো বিপদে পড়লে না। তাও করা যেতে পারে, যদি তুমি ভয় পেয়ে থাক এবং ঝুঁকি নিতে না চাও।

পুলিসের চেয়েও আমার বেশি ভয় ইনাসওরেন্স কোম্পানির ঐ সেলিম আলি লোকটাকে। লোকটা ভীষণ ধূর্ত। ও আমাদেরই খুনী বলবে।

তাহলে এই দেখ। হিমতভাই যে সুইসাইড করেছে তার প্রমাণ এই চিঠি। সে চিঠিখানা তার অ্যাটর্নি রোহিত মেটাকে লিখেছিল, চিঠিখানা আমাকে ডাকে দিতে বলেছিল কিন্তু আমি ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলুম। নেহাতই বিপদে পড়লে এই চিঠি আমি ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে দেখাব।

চিঠিতে কি লেখা আছে, দাও তো পড়ে দেখি, চন্দ্রা সাগ্রহে আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

এই চিঠি আমি তোমার হাতে দোবো না, আমি পড়ে শোনাচ্ছি

চিঠিখানা, আমি চন্দ্রাকে পড়ে শোনালুম। চিঠির বিষয়বস্তু শুনে চন্দ্রা বলল, অসিত ও চিঠিখানা আমার চাই।

না চন্দ্রা ও চিঠি আমি তোমাকে দেবো না, ভাগ্যিস চিঠিখানা ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলুম, চিঠিখানা আমার রক্ষাকবচ, পরে যদি তুমি আমাকে দশ লাখ টাকার ভাগ দিতে না চাও তখন আমি এই চিঠি ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে দেখিয়ে বলব যে হিমতভাই খুন হন নি, তিনি সুইসাইড করেছিলেন অতএব তাঁর পরিবর্তিত শর্ত অনুসারে জীবনবীমার টাকা তাঁর স্ত্রী দাবি করতে পারেন না।

তবুও চিঠি আমার চাই অসিত, চন্দ্রা আমাকে অনুনয় করে বলে লক্ষ্মীটি অসিত চিঠিখানা আমাকে দাও, এস আমার কাছে এস, আমার বুকে এস।

তোমার বুকে আমি যেতে পারি চন্দ্রা তাই বলে এই চিঠি আমি তোমাকে দেবো না, এই চিঠিখানা আমি আমার ব্যাংকের লকাকে জমা রাখব এবং ভবিষ্যতেও এই চিঠি আমি তোমাকে দেবো না।

তুমি তাহলে চিঠিখানা আমাকে কিছুতেই দেবে না অসিত? তার মুখের রেখাগুলো কঠোর হয়। সে তার খাট থেকে নেমে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চিরুনি দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াতে আরম্ভ করে।

চন্দ্রার মুখের ভাব ভাল নয়, হঠাৎ সে চুল আঁচড়াতে গেল কেন? আমার কেমন সন্দেহ হয়। আমি চুপিসারে ওর ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়াই। আয়নায় ও আমাকে দেখতে পেয়ে বলে, চিঠিখানা দিলে ভাল করতে অসিত, বলতে বলতে চন্দ্রা চিরুনিখানা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে। চন্দ্রার কথা বলার ভঙ্গিতে আমার সন্দেহ হয়, ওর কোনো বদ মতলব আছে।

চন্দ্রা ড্রেসিং টেবিলের দ্বিতীয় ড্রয়ারখানা খোলে। ড্রয়ার খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পাই রিভলভারটা। রিভলভারটা নেবার আগেই আমি চন্দ্রার হাত চেপে ধরি।

চন্দ্রা বোধহয় এককালে যুযুৎসু শিখেছিল, পুরুষকে ঘায়েল করবার প্যাঁচ আয়ত্ব করেছিল। সে নানাভাবে আমাকে কাবু করবার চেষ্টা করে। আমি দুর্বল হলে চন্দ্রা আমাকে মেঝেতে ফেলে দিত কিন্তু সে গায়ের জোরে

আমার সঙ্গে পারবে কেন ? ধস্তাধস্তির ফলে আমার আদিম রিপু প্রবল হয়ে উঠেছিল। ঠেলতে ঠেলতে আমি তাকে তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে ফেলি এবং বুকের ওপর চেপে বসি।

চন্দ্রা প্রবল বাধা দিতে থাকে কিন্তু ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ে ও আত্মসমর্পণ করে। ··তোমার সঙ্গে পারা গেল না অসিত, চিঠিও দিলে না, আমাকেও উপভোগ করলে।)

সত্যি চন্দ্রা এমন আনন্দ আমি জীবনে খুব কম উপভোগ করেছি। এখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে ঘুমোও, আমি তোমার রিভলভারটাও নিয়ে যাচ্ছি, এবার যা করবার আমি করব, তবে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই করব। আমি কাল লাঞ্চের আগে তোমার সঙ্গে কথা বলব, আমি সকালে কিছু কাজে বেরোব. ফিরে এসে তোমার হাতের রান্না খাব, খেতে খেতে কথা বলব।

পরদিন সকালে সুরাট ব্যাংক খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যাংকের লকারে চিঠিখানা, হিমতভাই ও চন্দ্রার রিভলভার দুটো ভাল করে প্যাক করে জমা রাখি।

হিমতভাই যে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল এ প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করতে পারে। তার পাওনাদাররা ত বটেই, অনেকে বাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করবে হিমতভাই কোথায় গেল ?

আমি ঠিক করলুম তাদের বলব হিমতভাই কয়েকটি আরবরাষ্ট্র থেকে কয়েক রকম মাল সরবরাহের প্রস্তাব পেয়েছে। হিমতভাই নতুন কোম্পানি গঠন করবে। সেই বিষয়ে কথা বলতে হিমতভাই প্রথমে সাউদি আরব এবং পরে কুয়েত ও সারাজ যাবে। দেখুন না হিমতভাই ব্যবসাজগতে আবার ফিরে আসবে। কচ্ছ এলাকায় একরকম দুষ্প্রাপ্য ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই ধাতুর সম্বন্ধে মেক্সিকো এবং জাপান অত্যন্ত আগ্রহী। এ বিষয়ে প্রাথমিক ব্যয়ভার ঐ দুই দেশ গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে, হিমতভাই এ বিষয়ে গুজরাট সরকার ও ভারত সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন। আপনারা বড়জোর মাসখানেকের মধ্যেই হিমত-ভাইয়ের নতুন অফিস দেখতে পাবেন।

লাঞ্চের কিছু আগে আমি গ্রীনপার্কে ফিরে চন্দ্রার ঘরে ঢুকলুম। চন্দ্রা ঘরে ছিল না, কিচেনে ছিল। চানিয়া ও ছোট ব্লাউস পরে সে কিছু রান্না করছিল। আমাকে দেখে বলল, ঘরে গিয়ে বোসো আমি এখনি আসছি। এখনই খেতে বসবে না একটু পরে?

তুমি কিচেন থেকে এস, তোমার সঙ্গে কয়েকটা প্রাথমিক আলোচনা করবার আছে, তারপর খেতে বসব।

দশ মিনিট পরে চন্দ্রা এল। একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চিঠিখানা কি করলে?

চিঠির কথা তুমি ভুলতে পারছ না? চিঠি নিরাপদেই আছে। চিঠির কথা এখন থাক, আগে আমাকে বল তুমি আমার দলে কি না? এবং আমি যা করতে চাই তা করব কি না।

বেশ আমি তোমার দলে। তুমি কি করতে চাও?

আজ শনিবার, কাল রবিবার, এ দুটো দিন আমি বাদ দিচ্ছি কিন্তু সোম মঙ্গলবার থেকে জানাজানি হয়ে যাবে যে হিমতভাই তার পুরনো অফিসে আর বসছে না। তখন লোকে বাড়িতে ফোন করবে বা আসবে, পাওনাদারও আসবে। পাওনাদারদের আমি ঠেকাব তবুও হাতে কিছু টাকা রাখতে হবে, আমি হাজার পাঁচেক দিতে পারি, তুমি কত দেবে?

এখনি অত টাকা কোথায় পাব? চন্দ্রা বলে।

কেন? তোমার ক্যাডিলাকখানা বেচে দাও না? এই বরোদা শহরেই আরব দেশের দালাল আছে, তারা নগদ টাকায় গাড়ি কিনে বুলসার বা ভেরাবলে নিয়ে যাবে, সেখান থেকে তারা গাড়ি আরবে চালান করে দেবে, সে দায়িত্ব তাদের। যদি রাজি থাক তো আজ রাত্রেই লাখ খানেক টাকা পেয়ে যাবে।

বেশ রাজি, কিন্তু টাকা আমার নগদ চাই।

সে ব্যবস্থা হবে, তারপর শোনো, তোমার একজন আয়া রাখা দরকার। এ বাড়িতে শুধু তুমি আর আমি আছি এটা লোকে সন্দেহের চোখে দেখবে, আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ করবে, আমি একটি মেয়ে ঠিক করে দিতে পারি যে তোমার ঘরের সব কাজ করে দেবে, সে লেখাপড়াও জানে কিন্তু আয়া সেজে থাকবে।

এটা কি একান্তই দরকার ?

নিশ্চয়। সব দিক দিয়ে আমরা নিজেদের সন্দেহমুক্ত রাখতে চাই। তারপর শোনো কয়েকদিন পরে তুমি আমেদাবাদে একটা নার্সিংহোমের সঙ্গে কথা বলবে যে তোমার স্বামী বিদেশ থেকে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, চিকিৎসার দরকার।

আমেদাবাদে কেন ? বরোদাতেও তো ভাল নার্সিংহোম আছে ?

তা আছে, কিন্তু তোমার স্বামী অ্যালকোহলিজমে ভুগছে। অতিরিক্ত সুরাপানের ফলে তখন আর নেশা হয় না কিন্তু শরীরে নানারকম বিকৃতি ঘটে থাকে। একেই বলে অ্যালকোহলিজম। সে রোগের চিকিৎসার উপযুক্ত নার্সিংহোম বরোদায় নেই, আমেদাবাদে আছে, ফোনে কথা বলে তুমি ভর্তি করার একটা তারিখও ঠিক করবে।

তারপর ?

তারপর আমরা দু'জনে ডিপফ্রিজ থেকে হিমতভাইয়ের লাশ বার করে গাড়িতে তুলে একদিন রাত্রে আমেদাবাদ যাত্রা করব এবং পরদিন কোথাও হিমতভাইয়ের লাস পাওয়া যাবে এবং তোমাকে হাত পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় কোনো একটা বাড়িতে পাওয়া যাবে। এসবের খুঁটিনাটি আমরা পরে ঠিক করব। এখন খাবে চল।

আর একটা কাজ করতে হবে অসিত। হিমতভাইয়ের মোট ঋণের পরিমাণ জানতে হবে।

হিমতভাই অফিস থেকে অনেক কাগজপত্র তার অফিস থেকে আমাকে দিয়ে তো বাড়িতে আনিয়েছে। সেই কাগজগুলো দেখতে হবে। আমি যে মেয়েটিকে ঠিক করে দেবো সে সব কাজ সাজিয়ে এ কাজটা করতে পারবে। আমিও তার সঙ্গে বসব। চন্দ্রা বলে, কেন হিমতের অ্যাটর্নি রোহিত মেটা নিশ্চয় সব জানে, তাকে তো আমি বম্বেতে ফোন করতে পারি। রোহিতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল, মধুর বলতে পার।

বেশ তুমি তাহলে রোহিতের সঙ্গে কথা বল। রোহিতকে এ কথাও বলবে যে হিমতভাই নতুন ব্যবসায়ে নামছে, সে ক্যাপিট্যালিস্ট পেয়েছে, প্রাথমিক আলোচনা করতে ইস্ট অ্যাফ্রিকা আর মিডল ইস্ট গেছে। ইতিমধ্যে হিমতভাইয়ের কি পরিমাণ ঋণ আছে তার একটা হিসেব চাই।

যে সম্পত্তি আছে সেসব বেচে সব ঋণ শোধ হবে কি না তার একটা স্টেটমেণ্ট যেন রোহিত করে রাখে। হিমতভাইয়ের ইচ্ছে সে হেডঅফিস গোয়া অথবা বম্বেতে করবে। এ কথাটাও জানিয়ো যে চেকআপ বা চিকিৎসার জন্যে হিমতভাইকে কিছুদিনের জন্যে তাকে আমেদাবাদে একটা নার্সিংহোমে পাঠান হবে।

চন্দ্রা বলে, কিন্তু অসিত রোহিতকে আপাততঃ কিছু না জানালুম।

না, চন্দ্রা ওটা দরকার কারণ পুলিস নিশ্চয় হিমতভাইয়ের অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ করবে। অ্যাটর্নিকে অন্ধকারে রাখা উচিত হবে না।

তুমি যে আয়া রাখবে বলছ সে কোন ঘরে থাকবে?

কেন তোমার বাথরুমের ওপাশে করিডরের শেষে যে ছোট ঘরখানা আছে সেই ঘরে থাকবে। তাকে কিন্তু বলা হবে বাড়ির কর্তা অসুস্থ, তিনি তিন তলায় ছাদের ঘরে থাকেন, তাঁকে বিরক্ত করা ডাক্তারের নিষেধ। সেজন্যে তিনতলায় যাবার দরজা তালা বন্ধ করে রাখা হয়, তবে তুমি ও আমি তাঁর সব তদারক করি।

সে যদি ডিপফ্রিজ খুলে ফেলে? তালা বন্ধ করে রাখলে হয় না?

না চন্দ্রা, ডিপফ্রিজে কেউ তালা বন্ধ করে না, তাহলেই তার সন্দেহ হবে। সে যাতে সহসা ডিপফ্রিজ খুলে না ফেলে সেজন্যে আমি হিমতভাইয়ের অফিস থেকে আনা সবকটা মদের বোতল ডিপফ্রিজের ওপর সাজিয়ে রাখব। তবে যে মেয়েটিকে আমি আনব সে কম কথা বলে এবং সব কিছুতে তার কৌতূহল নেই।

মেয়েটি কে? তোমার কোনো প্রেমিকা নাকি?

আরে না, আমি আগে যে অফিসে কাজ করতুম সেই অফিসের স্টেনো প্রীতি পারেখের বোন সুমতি পারেখ। বছর বাইশ চব্বিশ বয়স হবে। সব কাজ করবে। প্রীতি আমাকে বলেছিল ওর একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে।

লাঞ্চ খেতে খেতে এইসব আলোচনা হল। চন্দ্রাকে আমি বললুম, আমি আবার গ্যারাজের ওপরে নিজের ঘরে ফিরে যাব। আর একটা কথা, বিকেলে আমি বিউইক গাড়িখানা নিয়ে একবার বেরোব।

কেন ক্যাডিলাক নিয়ে যাবে না?

সে কাল, আমি আরবের দালালের সঙ্গে আগে যোগাযোগ করি, তারপর। বিউইকটা নিয়ে বেরোতে চাইছি কারণ গাড়িটা আমি চালিয়ে একবার দেখে নিতে চাই সব ঠিকঠাক আছে কি না। তারপর গাড়ির লগেজবুটটা বেশ বড়, হিমতভাইয়ের বডি ঐ গাড়ি করেই পাচার করতে চাই। তাছাড়া একটা পরিত্যক্ত খালি বাংলোবাড়ি এখন থেকে দেখে রাখতে হবে যেখানে তোমাকে 'বন্দী' করে রাখা হবে। বাড়িটা নির্জন জায়গায় হবে অথচ কাছে রাস্তা বা অন্য বাড়ি থাকবে যাতে তুমি চিৎকার করলে বা আওয়াজ করলে অন্য লোক শুনতে পাবে।

আমার কিন্তু সাহস হচ্ছে না, তবে এতদূর এগিয়ে গেছি যে পেছিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়, বডিটা যে ডিপফ্রিজে রাখা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় হিমত সুইসাইড করার পরই আমরা যদি শুধু রিভলভারটা লুকিয়ে রাখতুম তাহলে কাজ অনেক সহজ হত। ও যে সুইসাইড করছে তা অ্যাটর্নিকে লিখে জানালেও, সে চিঠি তো আমাদের হাতে। বাড়িতে থাকলেও খুন যে আমি করেছি তা পুলিসের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হত না আমি তার ব্যবস্থা করতে পারতুম। আমার এমন কয়েকজন লাভার আছে যারা আমার জন্যে মিথ্যা সাক্ষী দিত। তারা কেউ বলত তারা অমুক সময়ে আমাকে অমুক জায়গায় দেখেছে, আর একজন বলত হিমতভাইয়ের মৃত্যুর সময় আমি তার বাড়িতে ছিলুম।

সে কাজ তো আমরা এখনও করতে পারি কিন্তু তবুও পুলিস তোমাকে ছাড়ত না, বলত হিমতভাইকে খুন নিজে না করলেও তুমি কাউকে দিয়ে করিয়েছ কারণ তোমার মোটিভ আছে। তাছাড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট সেলিম আলি যে রকম ধূর্ত ও তুখোড় লোক বলছ সে তোমাকে ঠিক জব্দ করত। তোমার সাজা হয়ে যেত, টাকাও পেতে না।

তুমি কি ডিপফ্রিজ খুলে দেখেছ?

দেখেছি লাসের অবস্থা বেশ ভালই আছে।

যা করবার তাহলে তা তাড়াতাড়ি করে ফেল, দেরি কোরো না। আমি আবার রাত্রে তোমার সঙ্গে কথা বলব। আর যদি পার ত সেই মেয়েটিকে খবর দিয়ো। কাল সকাল কিংবা আজই এলে ভাল হয়।

ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ, আমি প্রীতি পারেখকে এখনি ফোন করছি।

তাহলে আমি এখন আমার ঘরে যাই, তোমার প্ল্যানটার খুঁটিনাটি আমি রাত্রে শুনব।

পশ্চিমাঞ্চলে বিকেলটা বেশ বড় হয়। বেরোবার এখনও দেরি আছে। প্রীতি এখন অফিসে আছে। ওকে একবার ফোন করে দেখি।

ফোন ধরল জয়ন্তীভাই। প্রীতিকে চাইতে জিজ্ঞাসা করল, প্রীতিকে কেন? ওকে ফাঁসিও না যেন, তাহলে আমার অফিসটি অচল হয়ে যাবে। তোমার সেই কাজ কতদূর এগোল?

প্রীতিকে ফোন করার উদ্দেশ্য বললাম এবং বললাম যে সেদিকের কাজ এখনও কিছু হয় নি, কিছু হলে তাকে জানাব।

প্রীতি ফোন ধরতে তাকে বললাম সুমতির জন্যে একটা ভাল চাকরি ঠিক করেছি। খাওয়া পরা থাকা সব মিলিয়ে দুশো টাকা কিন্তু সব কাজ করতে হবে। বোনকে আজই পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়।

প্রীতি বলে তাদের পাশের বাড়িতে ফোন আছে। সে এখনি সুমতিকে ফোন করে আজই বিকেলে গ্রীন পার্কে পাঠিয়ে দেবে।

সিনেমার ডিরেকটর যেমন লোকেশন ঠিক করতে শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে আমিও লোকেশন দেখবার জন্যে বিউইক গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

লোকেশন ঠিক করতে আমাকে বেশি ঘোরাঘুরি করতে হল না। গ্রীণ পার্ক থেকে বিউইক গাড়ি নিয়ে আমি আমেদাবাদ রোড ধরে উত্তর দিকে চললুম। চমৎকার রাস্তা। মাঝখানে কোথাও বুগেন ভেলিয়া, কোথাও রক্তকরবী ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটে আছে।

একটু পরে দশরথ গ্রাম পার হলুম। রামায়ণের সব নায়কনায়িকার নামে ভারতে অনেক গ্রাম বা শহরের নাম আছে কিন্তু দশরথের নামে গ্রাম আমি এই প্রথম দেখলুম।

ডানদিকে দশরথকে রেখে বাঁ দিকে ফার্টিলাইজার নগরও পার হলুম। গুজরাট ও ভারত সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় যে বিরাট সার কারখানা তৈরি হয়েছে তারই সংলগ্ন এই ফার্টিলাইজার নগর কলোনি। সুন্দর শোভা এই

কলোনির। এত রকমের এত সুন্দর গাছ লাগানো হয়েছে এবং এত প্রচুর পরিমাণে যে মনে হবে যেন বনের ভেতরে শহর তৈরি করা হয়েছে।

গাড়ি চলছে জলের মতো। এই রাস্তায় প্রচুর গাড়ি চলে বিশেষ করে অয়েল ট্যাংকার, কারণ সার কারখানার পরই গড়ে উঠেছে রিফাইনারি ও পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা। পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন ইত্যাদি বোঝাই করবার জন্যে এই রাস্তা দিয়ে প্রতি মিনিটে চারখানা করে অয়েল ট্যাংকার যাচ্ছে হুসহুস করে। এছাড়া বাস, লাকসারি বাস, মিনিবাস, মোটরগাড়ি, মোটর সাইকেল, মোপেড, স্কুটার, সাইকেল, অটো-রিকশ হরদম যাওয়া-আসা করছে।

বাঁ দিকে ফার্টিলাইজার নগর রেখে খানিকটা এগিয়ে যেতেই কয়েকটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। আমেদাবাদ রোড থেকে আর একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। সেই রাস্তা দিয়ে গেলে কোন কোন কারখানায় যাওয়া যাবে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাইনবোর্ডগুলিতে।

আমি এই রাস্তা ধরলুম। রাস্তটা বেশ নির্জন। দুধারে প্রচুর গাছ গাছের পরে ক্ষেতখামার। বাড়িঘর চোখে পড়ছে না। একটু যেতেই দেখলুম ডান দিকে একটা সরু রাস্তা বেঁকে গেছে। গাড়ি থামিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলুম এ রাস্তা গেছে রনোলি গ্রামের দিকে।

গ্রামখানা একটু দেখা যাক। গ্রামে ঢোকবার মুখে ডান দিকে একতলা দুখানা বাড়ি চোখে পড়ল। তারপর একটা কাঠের প্যাকিং কেস তৈরির কারখানা। জায়গাটা বেশ পছন্দ হল। গাছে ঢাকা, নির্জন। বেশি বাড়ি নেই অথচ রাস্তা দিয়ে গাড়ি ও মানুষ চলাচল করে। এখানে যদি একটা খালি বাড়ি পাওয়া যায় ত বেশ হয়।

প্যাকিংকেসের কারখানাটা ছোট। গাছের আড়ালে একপাশে গাড়িখানা রেখে নেমে পড়লুম। কাঠের কারখানার পরে নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কাছেই বড় বড় শিল্প গড়ে উঠেছে, তাই বাড়ির চাহিদাও বাড়ছে।

কাঠের কারখানার ছুটি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কাঠের কারখানার পাশ দিয়ে আমি এগিয়ে চললুম। একটা নতুন বাড়ি যেন দেখা যাচ্ছে।

আমার অনুমান ঠিক। ছোট একটা নতুন বাড়ি, একতলা। কাছে এগিয়ে গেলুম। নির্জন। কোনো লোকজন নেই। বাড়ি তৈরি এখনও শেষ হয় নি। কাঠের কাজ চলছে, দরজা জানালা সব বসানো শেষ হয় নি, ইলেকট্রিকের কাজও চলছে।

এইতো আমার আদর্শ জায়গা। পাছেই আমেদাবাদ রোড। বিউইক গাড়ি চালিয়ে স্বামীকে নিয়ে, চন্দ্রা যখন আমেদাবাদের দিকে যাবে তখন মুখোশপরা দুজন লোক বড়গাড়ি দেখে গাড়িখানা হাইজ্যাক করে নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবে। কিছু না পেয়ে হেমন্তভাইকে খুন করে রাস্তায় ফেলে রেখে যাবে আর চন্দ্রাকে ফেলে রেখে যাবে এই বাংলোয় হাত পা বেঁধে।

জায়গাটি আমার বেশ পছন্দ হল। পাশে কাঠের কারখানা। চন্দ্রা চেঁচামেচি করলে লোকজন শুনতে পাবে। চারদিক ভাল করে দেখে আমি আবার গাড়িতে ফিরে আসি। তারপর গাড়িতে উঠে গ্রামের দিকে যাই। কয়েকখানা বাড়ি চোখে পড়ে, তারপর বেশ বড় ও বাঁধানো একটা দীঘি। দীঘির ওপারে একটা হাউসিং কলোনি যা এখানে সোসাইটি নামে পরিচিত। এরপর গ্রাম আরম্ভ হয়েছে। বাসস্ট্যাণ্ড, জলের ট্যাংক ও ক্লকটাওয়ার চোখে পড়ল। এরপর রাস্তাটা কাচা এবং রাস্তাটা ঘুরে আবার মেন রোডে গিয়ে পড়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলুম যে গ্রামে পঞ্চায়েত অফিস, পোস্ট অফিস, ইস্কুল, হেলথ ইউনিট আছে তবে থানা নেই, থানা দূরে। এ অঞ্চলে চুরি ডাকাতি হয় না। রাস্তার ধারে সাইকেল স্কুটার ইত্যাদি পড়ে থাকলেও চুরি যায় না। পুকুরে হাস সাঁতার দিয়ে বেড়ায় কেউ ধরে নিয়ে কেটে খায় না।

সব দেখে শুনে লোকেসন ঠিক করে আমি সন্ধ্যার মুখে গ্রীনপার্কে ফিরে গেলুম। গ্যারেজে গাড়ি তুলে বাড়িতে ঢোকবার সময় দেখি একটি যুবতী গাছ থেকে ফুল তুলছে। এই তো সুমতি এসে গেছে।

সুমতি আমাকে চেনে, আমিও চিনি। জয়ন্তীভাইয়ের অফিসে আলাপ হয়েছে। আমি সুমতিকে ডেকে নিয়ে বসবার ঘরে যাই।

কি সুমতি আমাকে চিনতে পার?

সে কি অসিতদা, আপনাকে আমি কতদিন প্রীতির অফিসে দেখেছি, আপনি আমাকে বাঁচালেন অসিতদা।

ওসব কথা পরে হবে, মিসেস শায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

হ্যাঁ, দেখা হয়েছে, কি কি কাজ করতে হবে তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমার থাকবার ঘরও ঠিক করে দিয়েছেন। আপনি আমার খুব উপকার করলেন।

মনে মনে ভাবি উপকার করলুম কি অপকার করলুম তা সময়ে বোঝা যাবে।

সুমতিকে বলি, শোনো সুমতি মন দিয়ে কাজ কর, সামনের মাসেই তোমার মাইনে আরও পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করব। শুধু একটা কথা, এখানে তুমি শুধু নিজের কাজটুকু করে যাবে অর্থাৎ তোমাকে যেটুকু কাজ করতে বলা হবে সেইটুকুই করবে, তার বেশিও নয় কমও নয়, আর একটা কথা মনে রাখবে কোনো প্রশ্ন করবে না, কোনো কিছুতে অযথা কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করবে না, মিসেস শা একটু বদমেজাজী আছেন। বেশি কথা বললে বিরক্ত হন, মনে থাকবে তো সুমতি ?

মনে থাকবে। উনি বললেন, মিঃ শা নাকি ভীষণ অসুস্থ, তিনতলায় তাঁকে রাখা হয়েছে, বাইরের কোনো লোক তিনি নাকি সহ্য করতে পারেন না। তাঁকে দেখাশোনা উনি নিজেই করেন আর মাঝে মাঝে তুমিও যাও। ওষুধ খাইয়ে আস, কি অসুখ ?

নারভাস ব্রেকডাউন। উনি শিগগির আমেদাবাদ নার্সিংহোমে যাবেন, ঠিক আছে। তোমার যখন যা কিছু দরকার বা কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবে, তাহলে এখন তুমি মিসেস শায়ের কাছে যাও।

ক্লকটাওয়ারের ঘড়িতে এগারোটা বাজল। গ্রীনপার্ক নিস্তব্ধ। পা টিপে টিপে প্রথমে সুমতির ঘরে যাই। সুমতি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একেই তো ওরা রাত্রি নটা বাজতে না বাজতে শুয়ে পড়ে, তার ওপর আমার নির্দেশ অনুসারে চন্দ্রা ওকে রাত্রের শেষে কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ গুলে দিয়েছিল। এটা ওকে রোজই দেওয়া হবে।

এরপর চন্দ্রার ঘরের দিকে গেলাম। দরজায় আস্তে নক করতে ও আমাকে ভেতরে আসতে বলল। ঘরে ঢুকে দেখি চন্দ্রা যথারীতি তার চানিয়া ও চেলি পরে বুকে বালিশ রেখে বিছানায় উপুড় হয়ে কি লিখছে। কাছে গিয়ে দেখি, ছোট একটা ফাইলে অনেকগুলো বিল আটকানো রয়েছে,

একটা ডায়েরি খোলা রয়েছে, আর একটা কাগজে চন্দ্রা যোগ বিয়োগ কষছে।

আমি ঠাট্টা করে বললুম, কি গো ডার্লিং পুরনো লাভলেটার দেখছ নাকি?

যা বলেছ, লাভলেটার নয়, আমি একটা হিসেব করছিলুম যে আমার বাবদ হিমতভাইয়ের কত ধার আছে। হিসেব করে দেখলুম খুব বেশি নয়, পুরো লাখ টাকাও নয়। তুমি সুমতিকে নিয়ে দুএক দিনের মধ্যে ওর হিসেবটা করে নিয়ো।

তুমি রোহিত মেটাকে ফোন করেছিলে?

করেছিলুম, সে সোমবার বিকেলে মানে কালই আসছে, সঙ্গে হিমতভাইয়ের ঋণের মোটামুটি একটা স্টেটমেণ্ট নিয়ে আসবে বলেছে।

তাহলে তো তুমি কাজ অনেক এগিয়ে রেখেছ, কাল তাহলে সোমবার, কাল থেকেই বোধ হয় আমাকে পাওনাদার তাড়াতে হবে। সুমতিকে কিরকম মনে হচ্ছে?

কয়েক ঘণ্টা মাত্র তো দেখলুম, তবে মনে হয় চলে যাবে।

তিনতলায় 'রোগীর' ঘরে মাঝে মাঝে গিয়েছিলে? 'রোগীকে' খাইয়ে এসেছ?

হ্যাঁ, কয়েক পিস পাতলা রুটি, এক বাটি স্যুপ আর একটা প্যাঁড়া নিয়ে ওপরে গিয়েছিলুম। রুটিগুলো ছাদে ফেলে দিলুম, সকালে কাকে খেয়ে নেবে, স্যুপটা বেসিনে আর প্যাঁড়াটা নিজে খেয়ে ফেললুম। কয়েকটা দিন এই করতে হবে আর কি। চল শোফায় গিয়ে বসি।

শোফায় আমরা পাশাপাশি বসলাম, দুজনেই সিগারেট ধরালাম। চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করল, আজ বিকেলে বিউইক নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?

'লোকেশান' ঠিক করে এলুম, ঐখানেই 'শুটিং' করব।

ন্যাকামো রেখে তোমার প্ল্যানটা একটু খুলে বল তো?

হিমতভাইয়ের দেনাদাররা আসতে আরম্ভ করলে তাদের বলব নতুন ব্যবসায়ের চুক্তি করতে হিমতভাই বাইরে গেছে, ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে কারণ তার শত্রু অনেক। তবে সে শীঘ্রই আগের অবস্থায় ফিরে আসবে, আশা করছি সামনের তিন চার মাসের মধ্যেই আপনাদের টাকাপয়সা সমস্ত মিটিয়ে দিতে পারবে।

ও তো হল পাওনাদার ঠেকাবার প্ল্যান, অ্যাকচুয়াল প্ল্যানটা বল। অ্যাকচুয়াল প্ল্যানটা হল আগামী রবিবার রাত্রি দশটা নাগাদ হিমতভাই বিউইক গাড়ি চেপে নার্সিং হোমে যাবে। সন্ধ্যা নাগাদ কোনো অছিলায় আমরা সুমতিকে কোনো কাজে কোথাও পাঠাব, কিন্তু ওকেও তো প্রয়োজন আছে, হিমতভাই যখন তোমার সঙ্গে নার্সিং হোমে যাবার জন্যে গাড়িতে উঠবে তখন সাক্ষী থাকবে। সুমতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে আমরা হিমতভাইকে ধরাধরি করে ডিপফ্রিজ থেকে বার করে বিউইকের লগেজবুটে ভরে রাখব। তারপর সুমতি ফিরে এসে আমাকে দেখতে পাবে না, আমি লুকিয়ে বাড়িতেই থাকব। সুমতি ফিরে এলে আমি হিমতভাই সেজে তোমার কাঁধে ভর দিয়ে বিউইক গাড়িতে উঠব। হিমতভাই সাজতে আমার দরকার একটা কালো চশমা আর কম্ফটার আর তার একটা কোট। সুমতি কোনোদিন হিমতভাইকে চাক্ষুষ দেখে নি। তারপর তুমি হিমতভাইকে গাড়িতে তুলে গ্রীনপার্ক থেকে বেরিয়ে খানিকটা গিয়ে কোথাও গাড়ি থামাবে। আমি মেকআপ ছেড়ে গ্রীনপার্কে ফিরে এসে সুমতির কাছে শুনব যে তোমরা এইমাত্র বেরিয়ে গেছ। শুনেই আমি ছুটে চলে আসব এবং তোমার গাড়িতে উঠব। রনোলি গ্রামের বাইরে নির্জন একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি দেখে এসেছি, তুমি সেই বাড়িতে বন্দী হয়ে থাকবে। তার আগে হিমতভাইয়ের লাসটা রাস্তার ধারে কোথাও ফেলে দেবো। রাত্রে বা পরদিন ভোরে তোমার চেঁচামেচিতে আকৃষ্ট হয়ে লোকজন ছুটে আসবে। তুমি বলবে মুখোশ পরা দুজন লোক রাস্তায় তাদের গাড়ি থামিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ে। তুমি অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে আমেদাবাদে নার্সিংহোমে যাচ্ছিলে।

রাত্রে কেন যাব?

দিনের আলো হিমতভাই সহ্য করতে পারে না, তারপর শোনো, তোমাকে ওরা আঘাত করে অজ্ঞান করে দেয় এবং পরে কি ঘটেছে তা তুমি জান না।

কিন্তু গুণ্ডারা হিমতভাইকে খুন করবে কেন?

তা তুমি কি করে জানবে? তুমি ত তখন অজ্ঞান, পুলিস সেই গুণ্ডাদের খুঁজে বার করুক, তারা বলবে তারা হিমতভাইকে কেন খুন করল।

তাহলে এই হল তোমার মাস্টারপ্ল্যান ? কিন্তু প্ল্যানটা আমার কাছে বেশ সরল মনে হচ্ছে না, আমি একটু খতিয়ে দেখি আর জায়গাটাও আমি এর মধ্যে এক সময়ে দেখে আসব। ও অঞ্চল আমি চিনি, একাই যাব।

খতিয়ে দেখ, চিন্তা কর। সাইট দেখে এসো সামনের রবিবার। হাতে এখনও যথেষ্ট সময় আছে। রবিবার কাঠের কারখানাতেও ছুটি থাকে। তবে রবিবারের পর আর দেরি করা চলবে না কারণ যত দেরী হবে ততই লোকজন হিমতভাইয়ের খবর নেবে, লোকটা কবে ফিরবে ? গেল কোথায় ?

হিমতভাইয়ের অ্যাটর্নি রোহিত মেটা সোমবার বিকেল নাগাদ বম্বে থেকে এসে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করল। বেঁটেখাটো মোটা সোটা মানুষটি সদা হাস্যময় কিন্তু তাঁর গাঁটে গাঁটে কূটবুদ্ধি। চন্দ্রার সঙ্গে তার বনে ভাল, দুজনে সদ্ভাবও আছে।

রোহিতকে দেখেই চন্দ্রা দারুণ অভিনয় করে দিল। তার চোখ ছলছল করতে লাগল। কাঁদো কাঁদো স্বরে রোহিতকে চন্দ্রা বলল, হিমতের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। সে আমাকেও সহ্য করতে পারছে না, মানুষকে দেখা দূরের কথা, মানুষের পায়ের শব্দ সহ্য করতে পারছে না। নতুন বাঙালী সেক্রেটারি অসিত চৌধুরীকে কি চোখে দেখেছে জানি না, ওকে ছাড়া আর কাউকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। অসিত ওর ঘরে ঢুকলেই আমাকে উদ্দেশ্য করে বিশ্রী সব গালাগালি করে, সে ভাষা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়।

ইনিয়ে বিনিয়ে চন্দ্রা অনেক কথাই বলল। অসিত তো শুনে অবাক। সে আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল।

বুঝলে রোহিত এ বাড়িতে আমার আর এক মিনিটও থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

বল কি চন্দ্রা ? তাহলে তো তোমার এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই মঙ্গল, নইলে তুমি তো অসুখে পড়বে।

না রোহিত আমাকে বোধহয় বাড়ি ছাড়তে হবে না, হিমত চিকিৎসার জন্যে নার্সিংহোমে যেতে রাজি হয়েছে, তবে বরোদায় নয় আমেদাবাদে একটি নার্সিংহোমে যাবে, সব ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু ও যে নার্সিং হোম

থেকে ফিরে আসবে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না। কিন্তু রোহিত একথা কাউকে বোলো না, পাওনাদাররা তো একে একে আসতে আরম্ভ করেছে। কি যে করি!

দেখ চন্দ্রা তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি যদি ওর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাও তো ওকে ডিভোর্স কর। তাহলে তোমাকে আমি কিছু পাইয়ে দিতে পারি, সেসব আইনের মারপ্যাঁচ আছে।

তা কি করে হয় রোহিত, ও এখন আমাকে না হয় সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু আমি জানি ও মনে মনে আমাকে চায়। আর ক'টা দিনই বা, শেষ অবস্থায় ওকে ডিভোর্স করে লোক হাসিয়ে কি লাভ?

চন্দ্রার অভিনয় দেখে আমি তাজ্জব! কত ছলই জানে এই সুন্দরী! না জানি আরও কত পুরুষের মাথা খাবে এই ছলনাময়ী।

আধঘণ্টা এইভাবে কথাবার্তা চলার পর চন্দ্রা আমাকে ডেকে রোহিত মেটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আমার প্রশংসায় চন্দ্রা পঞ্চমুখ। এই বিপদের সময় আমি না থাকলে চন্দ্রা যে কি করত কে জানে! যদিও আমি নতুন তাহলেও আমার মতো এমন প্রভুভক্ত যুবক সে আর দুটি দেখে নি। চন্দ্রা বলল যে সুমতি নামে একটি মেয়েকেও কাজে ভর্তি করা হয়েছে। সে চন্দ্রার সব কাজে সহায়তা করছে।

রোহিত মেটা জিজ্ঞাসা করল, হিমতভাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব নাকি?

আরে সর্বনাশ! অমন চিন্তাও কোরো না, এখনি ক্ষেপে উঠবে। ওকে তো আমি সামনের রবিবার আমেদাবাদ নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি। ফিরে এলে, মানে যদি ফিরে আসতে পারে তখন দেখা করো। তবে আমার ইচ্ছে ওকে নিয়ে আমি বম্বে চলে যাব।

দেখ চন্দ্রা তোমার স্বামী দেবতাটি যদি সুস্থ হয়েই ফিরে আসেন তবে আমি তোমাকে পরামর্শ দেবো ডিভোর্স করতে। তুমি তাহলে বেঁচে যাবে, কিছু অর্থও পাবে। দেনা ওর অনেক, তবে এখন সম্পত্তিও কিছু আছে। সেসব বেচে দেনা শোধ করে হাতে লাখ দুই টাকা থাকতে পারে, তবে পাকা হিসেব তৈরি করতে হবে। ওর বোধহয় একটা মোটা ইনসিওরেন্স আছে। যাইহোক অবস্থাটা আমি বুঝে গেলুম, অফিসে ফিরে ইনসিওরেন্স

পলিসির খোঁজ নেবো। ধারদেনার একটা স্টেটমেণ্টও তৈরি করতে হবে। আর তুমি ইতিমধ্যে এই ছোকরা আর নতুন মেয়েটিকে নিয়ে ক্লাব, ওয়াইন, টেলার, গ্রসারি স্টেশনারি ইত্যাদির একটা হিসেব তৈরি করে রাখবে। তারপর দেখি আমি কি করতে পারি।

রোহিতকে চা দেওয়া হল। তারপর আরও কিছু কথা বলে রোহিত বিদায় নিল। আজ রাতেই সে বম্বে ফিরবে।

পরদিন আমেদাবাদ থেকে প্রকাশিত একটি সচিত্র গুজরাটী সাপ্তাহিকে হিমতভাই শাহ সম্বন্ধে কিছু খবর ছাপা হল। হিমতভাই নাকি আবার ব্যবসায় নামছে। টেলিভিসনে কি সব কমার্শিয়াল প্রোগ্রাম করবে। আরও কি সব করবে। নতুন একটা কোম্পানি গঠন প্রায় শেষ। তারা প্রচুর ক্যাপিটাল নিয়ে বাজারে শীঘ্র নামবে।

আমি যখন মনোযোগ দিয়ে সাপ্তাহিকট. পড়ছিলুম সেই সময় বাগান থেকে সুমতি এল। সুন্দর একটা ছাপা শাড়ি পরেছে, হাতে এক গুচ্ছ ফুল। ফুলদানিতে রাখবার জন্যে একটা ফুলদানি খুঁজছে। আমি তার মনোভাব বুঝতে পেরে ফুলদানির জন্যে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে একদিকে চেয়ে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি জমে বরফ হয়ে গেল। ডিপফ্রিজ ক্যাবিনেটের মোটর বন্ধ !

আমার মুখ শাদা হয়ে গেল। হাত থেকে পত্রিকাখানা পড়ে গেল। সুমতি তা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, কি হল ? কিছু খারাপ খবর পড়লে নাকি ?

আমি তখন কি রকম হয়ে গেছি। সুমতি কি জিজ্ঞাসা করল আমি তা ভাল করে শুনলুম না। আমার বুঝি সর্বনাশ হয়ে গেল।

সুমতি এবার কাছে এসে একটু জোরেই জিজ্ঞাসা করল, কি হল মিঃ চৌধুরী ? শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?

সুমতির এই প্রশ্নে আমি নিজেকে সামলে নিলুম। মাথাটা একটু নেড়ে বললুম, হ্যাঁ মিস পারেখ, মাঝে মাঝে আমার কেমন যেন হয়, এখনি ঠিক হয়ে যাবে, একবার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। মাথায় নানারকম দুশ্চিন্তা ঘুরছে তো তাই। এই যেমন মিঃ শায়ের কথাই ধর না। তুমি এক কাজ কর মিস পারেখ, আমাকে বরঞ্চ একটু ব্র্যাণ্ডি দাও। ঐ আলমারিতে সামনেই আছে, লেমনেড মিশিয়ে দাও।

সুমতি যখন ব্র্যাণ্ডি আনতে গেল সেই ফাঁকে আমি উঠে ডিপফ্রিজারের সুইচটা আবার চালু করে দিলুম। সুইচটা কেউ অফ্ করে দিয়েছিল। কতক্ষণ বন্ধ ছিল? হিমতভাইয়ের লাসটা নষ্ট হয়ে যায় নি তো? অবশ্য চার ঘণ্টার মধ্যে কোনো ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই। চারঘণ্টা পর্যন্ত ফ্রিজারের টেমপারেচারের হেরফের হয় না, ওটা এমনভাবেই তৈরি কিন্তু তার বেশি সময় যদি বন্ধ হয়ে থাকে?

সুইচ অন করে আমি আবার যখন আমার চেয়ারে বসতে যাচ্ছি সেই সময়ে সুমতি ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ফিরে এল। আমি হাতে গ্লাস নিয়ে ওর দিকে চেয়ে একটু হেসে কয়েক চুমুক ব্র্যাণ্ডি খেয়ে বললুম, ঠিক হয়ে গেছে, কাল রাত্রে বোধহয় খাওয়ার গোলমাল হয়েছিল।

সুমতি আবার একটা ফুলদানি বা অনুরূপ একটা পাত্র খুঁজতে খুঁজতে ডিপফ্রিজের সুইচের দিকে চেয়ে সাধারণ ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, সুইচটা আপনি বুঝি অন করে দিলেন? আমিই ওটা অফ করে দিয়েছিলুম।

কতক্ষণ আগে?

এই মিনিট কুড়ি হবে বোধ হয়, মিসেস বলছিলেন ওটা নাকি খালি আছে। মিছেমিছি কারেণ্ট খরচ হচ্ছে ভেবে আমি ওটা অফ করে দিয়েছিলুম।

শোনো মিস পারেখ, খালি থাক আর না থাক, তুমি আর সুইচ অফ করো না। এই ফ্রিজার গুলোর মেকানিকস একটু অন্য ধরনের। ওর ভেতরে ফ্রস্ট জমে, পরে তা জল হয়ে ফ্রিজারের ক্ষতি করে, সে অনেক ব্যাপার, আমিও সব জানি না, যাই হোক এখন ঠিক আছে।

মাত্র কুড়ি মিনিট! আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সুমতি মেয়েটি বেশ ভাল। সে আমার কাছে ক্ষমা চাইল। এমনভাবে ক্ষমা চাইল যে আমি যেন ওকে এই মুহূর্ত থেকে ভালবেসে ফেললুম। ফ্রিজারের এই ব্যাপারটা আমি চন্দ্রাকেও বললুম না।

সুমতিকে বললুম, ঠিক আছে, কোনো ক্ষতি হয় নি। শোনো মিস পারেখ…

আপনি আমাকে সুমতি বলবেন।

বেশ তাই বলব, তুমিও তাহলে আমাকে আপনি বোলো না।

তাই হবে, কি বলছলে ?

অলংকার সিনেমায় খুব ভ একটা ছবি এসেছে। আজ বিকেলে যাব, তুমিও সঙ্গে যাবে, আপ। নেই ত ?

না, আপত্তি কিসের।

বৃহস্পতিবার দুপুরে চন্দ্রা আমার ঘরে এসে বলল, চা কর। আমি সুমতিকে একটা কাজে পাঠিয়েছি।

আমি চা তৈরি করলুম। চা খেতে খেতে আমরা আমাদের প্ল্যান নিয়ে আর এক দফা আলোচনা করলুম।

চন্দ্রাকে যেন আমার আর ভাল লাগছে না। সুমতি চন্দ্রার মতো সুন্দরী নয় ঠিকই কিন্তু যুবতী। ফটন্ত ফুল। আমার চোখে নতুন নেশা ধরিয়েছে।

চন্দ্রা প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল। নানারকম গল্প হল। সুমতি প্রসঙ্গে সে কয়েকটা মন্তব্য করলে। আমার দিকে কটাক্ষ করে এক সময়ে বলল, ছুঁড়ির প্রেমে পড়ে যেও না যেন।

আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম টাকাগুলো হাতে এলে কি করব ? সুমতিকে বিয়ে করব, অবশ্য ও যদি রাজি হয়। ওকে নিয়ে কলকাতা যাব। আরও কত কি ভাবতে থাকি।

এক সময়ে ঘড়ি দেখি বেশ রাত হয়েছে। চন্দ্রার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি সে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে কি লিখছে, হাতে সিগারেট। কি সুন্দর ও সুডৌল ওর নিতম্ব। আমি কয়েক সেকেণ্ড মুগ্ধ হয়ে দেখলুম। সুমতি কাছে বসে কিছু একটা সেলাই করছে। আমি যে দাঁড়িয়েছিলাম, সুমতি তা খেয়াল করল না।

নিজের ঘরে ফিরে এসে পাজামা আর গেঞ্জি পরে একটা সিগারেট ধরালুম। চেয়ারে বসে আবার চিন্তা। ঘুম আসছে না। অনেকগুলো সিগারেট খাওয়া হয়ে গেল। আর না। যাই বাথরুমে গিয়ে বেশ করে চোখেমুখে জল দিয়ে আসি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আমার নজরে পড়ল, ডিপফ্রিজ ক্যাবিনেট রয়েছে যে ঘরে সেই ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত্রে ও ঘরে

কে আলো জ্বাললে ? চন্দ্রার তো এখন ওঘরে আসবার কথা নয় ? আমি ঘরের দিকে এগিয়ে চললাম। দেখতে হচ্ছে তো ?

একটু ঘুরে সেই ঘরে যেতে হয় কিন্তু সেই ঘরে পৌঁছে আমি যা দেখলুম তাতে আমার ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে উঠল।

আমি দেখলুম সুমতি শুধু সায়া ও ব্লাউস পরে ক্যাবিনেটের ওপর থেকে সমস্ত গেলাস, বোতল ও আর যা কিছু ছিল সেগুলো সব সরিয়ে একটা কাবার্ডের ওপর রাখছে।

আমি একটু আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুমতিকে লক্ষ্য করতে লাগলুম। সুমতি যেন কেমন আচ্ছন্ন? কোনোদিকে বুঝি তার মন নেই।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেখান থেকে কিছু দূরে একটু মৃদু আওয়াজ হল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখি চন্দ্রা দাঁড়িয়ে। সেও আমাকে দেখতে পেয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, ছুঁড়িটা আমাদের সর্বনাশ করবে, ঐ দেখ ক্যাবিনেটের ডালা তুলে দেখছে, গলা টিপে ওকে মেরে ফেল

আমি ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চন্দ্রাকে চুপ করতে বলে আরও আস্তে বললুম, সুমতি ঘুমিয়ে আছে, শব্দ কোরো না, ও কি করছে বা দেখছে জানে না ও স্বপ্ন দেখছে, এক একজন ঘুমন্ত অবস্থায় অমন ঘুরে বেড়ায়।

সুমতি ক্যাবিনেটের ঢাকা বন্ধ করে আচ্ছন্ন ভাবেই নিজের ঘরে ফিরে গেল। চন্দ্রা বলল ও কিন্তু হিমতের লাস দেখেছে, ওর যদি কাল সকালে মনে পড়ে ? তুমি ওকে ছাদে নিয়ে গিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দাও। ঘুমন্ত অবস্থায় ছাদে গিয়েও তো মানুষ পড়ে মরে যেতে পারে।

আর ঝামেলা বাড়িয়ো না চন্দ্রা। কাল সকালেই জানা যাবে সুমতির কিছু মনে আছে কি না। তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও, আমি গিয়ে দেখে আসি ও নিজের বিছানায় শুয়েছে কি না।

সুমতির ঘরে গেলুম। পর্দা সরিয়ে দেখলুম নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। সুমতি বালিশে মাথা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। গভীর নিশ্বাস নিচ্ছে, পুরন্ত বুক ওঠানামা করছে।

হঠাৎ সে নড়ে উঠল। তার ঘুম ভেঙেছে। দরজার দিকে তার নজর

পড়েছে। একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আছে সুমতি, আমি অসিত কোনো ভয় নেই, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে বেড়াচ্ছিলে, তাই আমি দেখতে এসেছি তুমি ঠিক আছ কি না। তোমার এ রোগ আছে নাকি?

আছে। আমি স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়াই, তবে কখনো-সখনো

তোমার কি এরকম প্রায়ই হয় নাকি?

না প্রায় না, মাসে হয়ত একবার কি দু'বার। কেন আমি কি করছিলুম?

তুমি তোমার ঘুমের ঘোরে উঠে গিয়ে ডিপফ্রিজ খুলে দেখছিলে।

হ্যাঁ, ডিপফ্রিজটা সম্বন্ধে আমার সব সময়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ওটার আমি সুইচ বন্ধ করে খারাপ করে ফেললুম নাকি? দামী জিনিসতো!

আরে ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন? কারেন্ট চার ঘণ্টা পর্যন্ত বন্ধ থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।

তা তো আপনি বলেছেন কিন্তু স্বপ্নের ওপর তো আমার হাত নেই। স্বপ্নের ঘোরে আমি কি করেছি তা আমি জানি না, তবে স্বপ্নে আমি যা দেখেছি বলতে পারি।

ঠিক আছে ও নিয়ে আর মাথা ঘামিও না, এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়। গুড নাইট।

আমি সুমতির ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

শুক্রবার চন্দ্রার সঙ্গে আবার আলোচনা। পুলিস তো আসবেই, অতএব পুলিসকে আমরা কি বলব তাই নিয়ে পরস্পরে বারবার রিহার্সাল দিতে লাগলুম। এ যেন আমরা দুজনে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছি আর মাঝে মাঝে প্রশ্নোত্তরগুলো ঝালিয়ে নিচ্ছি। পুলিসকে আমরা দুজনে যে বিবৃতি দেবো তার মধ্যে কোথাও যেন কোনো অসামঞ্জস্য বা ত্রুটি না থাকে।

আমি চন্দ্রাকে বার বার সাবধান করে দিই। চন্দ্রা বিরক্ত হয়ে বলে, পুলিসকে আমি অনেকবার ঘোল খাইয়েছি। পুলিসের জেরা যে কি সাংঘাতিক তা তুমি জান না। তুমি নিজে ঠিক থেকো তো। ওরা মাঝে মাঝে ধাপ্পা দেবে। বলবে মিসেস শাহ অমুক বলেছে তমুক বলেছে, তোমাকে ঘাবড়ে দেবে, সেই সময়ে মাথা ঠিক রাখবে, তুমি তোমার বিবৃতি থেকে এক চুল নড়বে না এই হচ্ছে আমার কথা, একবার পা ফসকেছ কি গেছ।

চন্দ্রা ঠিকই বলেছে। পুলিস বড় সাংঘাতিক চিজ। একবার বেফাঁস কথা বলেছ কি গেছ। পুলিস তো আছেই, তার ওপর আছে ইনসিওরেন্স কোম্পানির সেলিম আলি, ভীষণ ঢুঁদে লোক। অনেক জাল ইনসিওরেন্স ধরেছে। দু'চারটেকে নাকি ফাঁসিতেও লটকেছে।

এখন আমি নির্ভয়ে এবং স্বচ্ছন্দে যে কোনো পুলিসের পাশ দিয়ে চলে যেতে পারি কিন্তু রবিবারের পর থেকে ব্যাপারটা অন্যরকম হবে। তখন আমার মনে হবে পৃথিবীর সব পুলিসই বুঝি আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, দেখতে পেলেই খপ করে ধরবে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সিনেমা দেখলুম। সিনেমা থেকে বেরিয়ে টিকিটখানা রেখে দিলুম। একটা নামী রেস্তঁরায় ডিস্কো শুনতে শুনতে আহার শেষ করলুম। রেস্তঁরার বিলখানা পকেটে রেখে দিলুম। পুলিস কোনো প্রশ্ন করলে কাজে লাগতে পারে।

শনিবার। হাতে কিছু কাজ ছিল। সেগুলো শেষ করতে সারা দিন কেটে গেল। দুপুরে চন্দ্রা উত্তম লাঞ্চ পাঠিয়ে দিয়েছিল। রান্না অতি উত্তম হয়েছিল কিন্তু খেতে খেতে মন খুঁত খুঁত করছে। কাজটা ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারব তো? টাকা ঘরে তুলতে পারব তো?

খাওয়া শেষ করে একটু ঘুমিয়ে নিলুম। বিকেলে বিউইক গাড়িখানা নিয়ে একবার বেরোলুম। রনোলি হয়ে পেট্রোকেমিক্যাল কারখানার পাশ দিয়ে বাজুয়া ও ফার্টিলাইজারনগর পার হয়ে ছানিতে এসে বাসস্টপে তেঁতুল গাছের তলায় চায়ের দোকানে এক কাপ চা খেলুম। সন্ধ্যার মুখে বাড়ি ফিরে গ্যারাজে গাড়ি তুলে নিজের ঘরে এসে পোশাক পালটে ইজিচেয়ারে বসে ভাবতে লাগলুম এইসময়ে চন্দ্রা বা সুমতি এলে বেশ হয়।

চন্দ্রা নয় সুমতিই এল। ঘরে ঢুকে বলল, অন্ধকারে বসে কেন? আলো জ্বালাও নি।

হঠাৎ কি হল? সুমতি আমাকে তুমি সম্বোধন করল কেন? সুমতি নিজেই আলো জ্বালল। পরণে হ্রস্ব পোশাক। শর্ট প্যান্ট ও হাতকাটা সাধারণ গেঞ্জি। দেহের রেখাগুলি অতি স্পষ্ট। এত ছোট পোশাকে আমি সুমতিকে দেখি নি। স্বাস্থ্য যেন উপচে পড়ছে। কিন্তু কিছু ক্লান্ত।

সুমতি তুমি কি একসারসাইজ করছিলে? হাঁফাচ্ছ কেন?

না, হাঁফাই নি তো, একসারসাইজ তো সকালে করি, শুধু স্কিপিং, এখন আমি চন্দ্রাদিকে ম্যাসাজ করছিলুম। কি সুন্দর বডি চন্দ্রাদির। যেন মাখন। আমি ওর কোমর, বুক আর উরু খুব চটকেছি। আমি মেয়ে আমারই লোভ হচ্ছিল, আচ্ছা চন্দ্রাদি তোমাকে ভালবাসে নাকি?

দূর, কি যে বল, ওসব বাজে চিন্তা মাথা থেকে নামাও তো?

আমার সন্দেহ হয়, তোমার ঘরে আসতে চাইলে আমাকে কিছুতেই আসতে দিতে চায় না কেন? নিশ্চয় হিংসে। তাছাড়া চন্দ্রাদি তোমার দিকে যেভাবে চায় তাতে আমার সন্দেহ হয় যে তোমাকে চন্দ্রাদি ভালবাসে। এমন হিরোর মতো চেহারা, যে কোনো মেয়ের লোভ হতে পারে।

বল কি? তাহলে তোমারও লোভ হয়?

ধ্যাৎ।

আমি সুমতির হাত ধরে টেনে আমার বুকে চেপে ধরে ওর ঠোঁটে চুমো খাই, সুমতি বাধা দেয় না। চুম্বন শেষ হলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ আর একটা প্রশ্ন করে যা শুনে আমার বুক ঢিব ঢিব করতে থাকে।

সে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা অসিত সত্যি করে বল তো মিঃ হিমতভাই না কি এই বাড়িতে আছেন?

আমি সহসা জবাব দিতে পারি না। গলা শুকিয়ে যায়। সুমতি কি কোনো ফাঁকে ওপরে গিয়ে কিছু দেখে এসেছে নাকি? সামলে নিয়ে বলি, কি যে বল সুমতি ··

আমার কি রকম সন্দেহ হচ্ছে, একটা মানুষ বাড়িতে থাকলে একবার কোনো একটা আওয়াজও শোনা যাবে। তাছাড়া চন্দ্রাদিও যেন তার স্বামী সম্বন্ধে নির্লিপ্ত।

আরে না না, মিঃ শা ঠিকই আছেন, তবে তাঁর অবস্থা খুব খারাপ, প্রায় আচ্ছন্ন হয়েই থাকেন, আজ দুপুরেই তো আমি তাঁকে দেখে এসেছি।

কি জানি কেন আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। তাছাড়া দেখ এই বাড়িতে থাকতে আমার ভাল লাগে না, কি রকম চুপচাপ ভাব।

ওসব গুলি মারো সুমতি, এস কাছে এস, আমি বোধহয় তোমার

প্রেমে পড়ে গেলুম। তুমি এই ছোট্ট পোশাক পরে আমার সামনে এলে কেন?

তাহলে ওটা তোমার ভালবাসা নয়, কাম?

কাম ছাড়া ভালবাসা হয় না, ওসব স্বর্গীয় প্রেমে আমি বিশ্বাস করি না।

আমিও করি না তবুও কাম দমন করা উচিত, কাম সর্বনাশ ডেকে আনে।

সুমতি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি চলি অসিত, চন্দ্রাদি এতক্ষণে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, ওর গায়ে আবার পাউডার মাখিয়ে দিতে হবে। সুমতি আর এক সেকেণ্ড না দাঁড়িয়ে চলে গেল। আশ্চর্য এই মেয়ে সুমতি পারেখ।

হিমতভাই বাড়িতে নেই, সুমতির এই সন্দেহের কথা আমি চন্দ্রাকে বললুম না। পুলিস নিশ্চয় সুমতিকেও জেরা করবে। সুমতি যদি তার সন্দেহের কথা পুলিসকে বলে?

আজ আমাদের চক্রান্তের প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ করতে হবে।

সন্ধ্যার মুখে আমি বিউইক গাড়িখানা চালিয়ে ছানি রোডের ধারে একটা পেট্রল পাম্পে রেখে এলুম। বলে এলুম গাড়িখানা যেন সার্ভিস করে রাখে, আমি পরে নিয়ে যাব, আজই বেশি রাত্রে হয়ত। বাসে করে আমি বাড়ি ফিরে এলুম।

ইতিমধ্যে চন্দ্রা সুমতিকে এমন একটা কাজে আটকে রেখেছিল যাতে সে আমাকে বাড়ি ফেরার পর দেখতে পায়।

রাত্রি সাড়ে ন'টা আন্দাজ সময়ে আমি ওপরে হিমতভাইয়ের ঘরে ঢুকলুম। একটা স্যুটকেস বার করে বিছানার ওপর রাখলুম। আমার প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট আর জুতো খুলে স্যুটকেসে ভরলুম, তারপর আমি হিমতভাইয়ের একটা স্যুট পরলুম। মাথায় দিলুম তারই একটা পরিচিত টুপি, ফেল্ট হ্যাট। আয়নায় একবার দেখে নিলুম। নিচে আবছা অন্ধকারে দূর থেকে সুমতি আমাকে দেখলেও চিনতে পারবে না।

হিমতভাইয়ের ছদ্মবেশে আমি তখন রেডি। অচেনা আশংকা বা অতর্কিত কোন বিপদের সম্ভাবনায় আমি নিজেকে নারভাস মনে করছি।

মস্ত বড় ঝুঁকি নিতে চলেছি। শেষ পর্যন্ত কি হবে জানি না। নিজেকে ঠিক রাখবার জন্যে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে একটা ফটোগ্রাফ চোখে পড়ল। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে চন্দ্রার একটা নগ্ন ফটোগ্রাফ। মনটা যেন বিক্ষিপ্ত হল।

আমাদের সময় ঠিক করা ছিল। ঠিক দশটার সময় চন্দ্রা গ্যারাজ থেকে রোলসরয়েসখানা বার করে আনবে। আমি জানালা দিয়ে নিচে চেয়ে দেখলুম চন্দ্রা রোলস বার করেছে। ঘড়ি দেখলুম, দশটা বেজে দুমিনিট।

চন্দ্রার পরনে সিলকের শাড়ি, সাদার ওপর বড় বড় লালফুলের ছাপ। কম আলোতেও চন্দ্রা ভাস্বর।

চন্দ্রা ওপরে উঠে এল। কাছে আসতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম ছুঁড়িটা কোথায়?

ছুঁড়ির জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। সে এখন কিচেনে। নিচে নামবে না, তবে কিচেনের জানলা দিয়ে তোমাকে দেখতে পাবে।

দেখবে তো? কারণ হিমতভাই শা তার স্ত্রীর সঙ্গে নার্সিংহোমে যাচ্ছে সেটা সুমতির দেখা দরকার, পুলিসকে সে বলতে পারবে।

আমরা নিচে নামলুম। এতক্ষণ আমাদের কেউ দেখতে পায় নি, দেখার সম্ভাবনাও নেই। শেষ ধাপে এসে আমি ক্লান্ত ও অবসন্ন রোগী হয়ে গেলুম। চলতে যেন পারছি না। মাঝে মাঝে খুক খুক করে কাসছি, রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে নইলে আমার কাসির আওয়াজ সুমতি চিনে ফেলতে পারে।

বাইরে বেরিয়ে চন্দ্রা আমাকে ধরে ধরে গাড়ির দিকে নিয়ে চলল। দোতলায় কিচেনের জানলায় সুমতি দাঁড়িয়ে। চন্দ্রা তাকে বলল, সুমতি আমি বাবুজীকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাচ্ছি। অসিত এখনও ফিরল না, তার তো সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাবুজীও আর ঘরে থাকতে চাইছে না।

সুমতি বলল আমি কি আপনাকে সাহায্য করব চন্দ্রাদি?

না, দরকার নেই, এই তো আমি গাড়িতে এসে পড়েছি। তুমি তোমার কাজে যাও।

আমার টুপিটা কপাল পর্যন্ত নামানো ছিল। যে কোট গায়ে ছিল

তেমন কোট আমি কখনও পরি না। অতএব ওপর থেকে আমাকে দেখে সুমতির পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।

চন্দ্রা গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমি কোমর বেঁকিয়ে যেন অতিকষ্টে গাড়ির ভেতর ঢুকলুম। চন্দ্রা ফিস ফিস করে বলল, সিটে শুয়ে পড়। আমি তোমার স্যুটকেসটা নিয়ে আসি। দরজা বন্ধ করে চন্দ্রা ওপরে চলে গেল। কয়েক মিনিট পরে হাঁফাতে হাঁফাতে সে আমার স্যুটকেসটা এনে গাড়ির মধ্যে ফেলে দিয়ে ড্রাইভারের সিটে বসে স্টার্ট দিল। গেট পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে বসলুম।

খানিকটা গিয়ে চন্দ্রা গাড়ি থামাল। আমি তাড়াতাড়ি হিমতভাইয়ের পোশাক ছেড়ে স্যুটকেশ থেকে নিজের পোশাক বার করে চটপট পরে নিলুম। জুতোটাও বদলে নিলুম। নিজের জুতো পরে গাড়ি থেকে বেরিয়ে চন্দ্রাকে বললুম, তুমি আলো নিবিয়ে অপেক্ষা কর আমি এখনি আসছি।

তাড়াতাড়ি করবে, এ রাস্তা দিয়ে হরদম গাড়ি যায়। হিমতভাইয়ের রোলস অনেকে চেনে, যদিও গাছের আড়ালে আছি তবুও কেউ দেখতে পারে। দেখো যেন সুমতি তোমাকে আবার না ধরে রাখে, বলে না যেন ন্যাকা সুরে, 'এত বড় বাড়িতে আমার ভয় করছে'।

আরে না না, সুমতি আমার কে ? হাতে টাকাটা এসে গেলে অমন অনেক সুমতি জুটবে। আমি এখনি আসছি।

গেটের কাছ থেকে আমি বাড়ির দিকে ছুটতে আরম্ভ করলুম। সুমতি বোধহয় তখনও কিচেনের জানালায় দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে নিচে নেমে এসে বলল, চন্দ্রাদি তো চলে গেল, তুমি ওদের গাড়ি দেখতে পাও নি ?

না তো, হঠাৎ আমার গাড়িখানা খারাপ হয়ে গেল। একটা সার্ভিস স্টেশনে ঠিক করতে বলে আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।

না চন্দ্রাদি চলে গেছে, তুমি কি যাবে নাকি ? আমার ভয় করছে, একটু থাক না প্লিজ।

না সুমতি, আমাকে জেতেই হবে, নইলে হয়ত আমার এমন ভাল চাকরিটাই যাবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি ফিরে আসব। বি এ গুডগার্ল।

সুমতি কোনো কথা বলল না। রেগে গেল বোধ হয়। জ্বল
দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। আমিও ঘুরে রাস্তা
ধরলুম।

চন্দ্রা রোলসে বসে সিগারেট ধরিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল
আমি গাড়িতে উঠে হিমতভাইয়ের কোট আর টুপিটা পরে নিয়ে সিটে
যতদূর সম্ভব নিচু হয়ে বসলুম।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ছুঁড়িটা তোমাকে
আটকাতে চায় নি?

হ্যাঁ, বলছিল সে ভয় পাচ্ছে, আমাকে কিছুক্ষণ থাকতে বলছিল কি
দেখতেই পাচ্ছ আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি।

ছুঁড়িটাকে আমার ভয়। কোনো বিপদ না ঘটায়। ওর সন্দেহ ছি
হিমতভাই বাড়িতে ছিল না, আমাকে জিজ্ঞাসাও করেছিল, তোমাকে কি
জিজ্ঞাসা করে নি?

না ত? আমি মিথ্যা কথা বললুম, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করবে
যাবে? একটা পুচকে মেয়েকে অত ভয় করলে চলে?

পুচকে মেয়ে কাকে বলছ? খোঁজ নিয়ে দেখ বাড়িতে দু চারটে পুচকে
বাচ্চা রেখে এসেছে কি না। ঠিক আছে আমি ফিরে এসে ওর ব্যবস্থা কর

অত জোরে গাড়ি চালিয়ো না। রাত্রি দশটার পর পুলিসের পেট্রল
বাইক এই রাস্তায় টহল দেয়। এটা মস্তবড় একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া
সরকার সর্বদা স্যাবোটাজের ভয় করে।

চন্দ্রা গাড়ির স্পিড একটু কমাল কিন্তু মিনিটখানেক পরে বল
তোমার কথা তো সত্যি দেখছি, পুলিসের একটা মোটরবাইক আসছে, স
পুলিসই আমার রোলস চেনে।

চিনলেই বা আমাদের ভয় কিসের? আমরা তো আমেদাবাদ নাি
হোমে যাচ্ছি। পুলিস গাড়ি চিনে রাখলে ভালই হবে। তোমাকে
কিডন্যাপ করা হয়েছিল সেকথা তারা বিশ্বাস করবে।

কিন্তু একটু পরেই আমাদের বাঁ দিকে বেঁকে রনোলির পথ ধরতে হ
তার আগে যেন পুলিসের মোটরবাইকটা আমাদের গাড়ি ছাড়িয়ে যা
নইলে আমরা অসুবিধেয় পড়ব।

আমি টুপিটা কপাল পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে আরও একটু নিচু হয়ে সলুম। আমাদের ভাগ্য ভাল। পুলিসের মোটরবাইক আমাদের গাড়ি অতিক্রম করে চলে গেল। যাবার আগে মুখ ঘুরিয়ে ওরা আমাদের গাড়ি দেখে গেল। চালক ছাড়া পিলিয়নেও একজন লোক ছিল। ওরা বেশ জোরে গেল, বোধহয় কাউকে অনুসরণ করছে।

আরও মাইলখানেক যাবার পর বাঁ দিকে একটা রাস্তা বেঁকে গেছে। রাস্তাটা গেছে গুজরাট অ্যালকালি ও ক্যামিক্যাল কারখানা এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি কারখানার দিকে। এই রাস্তা দিয়ে রনোলি রেলস্টেশনেও যাওয়া যায়।

আমরা ঐ বাঁ দিকের রাস্তা ধরলুম। খানিকটা যাবার পর ডান দিকে কাঁচা রাস্তা রনোলি গ্রামের দিকে গেছে। মোড় ঘোরার পরেই বেশ বড় বড় আম ও কয়েকটা গাছের আড়ালে সেই বাংলো বাড়িটা, যেটা আমি আগে দেখে গেছি।

এখানে প্রচুর গাছ। একটা বন বললেই চলে। বাংলোর গেটের সামনে একটু খোলা জায়গায় গাড়িখানা দাঁড় করিয়ে আমরা গাড়ি থেকে নামলুম। হিমতভাইয়ের কোট, প্যাণ্ট, জুতো ও টুপি তার স্যুটকেসে ভরে গাড়ির লগেজবক্সে রেখে দিলুম।

বাংলোর গেট খোলা ছিল। দরজায় সস্তা দামের সাধারণ একটা তালা লাগানো ছিল। আমার পকেটে একটা 'মাস্টার-কি' ছিল। ওটা ভাণ্ডবীর বাজারে কিনেছিলুম। সামান্য নাড়াচাড়া করতেই তালা খুলে গেল। পকেট থেকে ছোট টর্চ বার করলুম।

সামনের ঘরটাই অফিসঘর, তারপরে বেশ বড় একটা ঘর। ঘরের এক দিকে প্রায় দেওয়াল ঘেঁষে অনেকগুলো প্যাকিং কেস একটার ওপর আর একটা বসানো রয়েছে। এই রকম তিন চার সারি প্যাকিংকেস রয়েছে। কোনোটা খালি নয়। ভেতরে বোধহয় মেসিন আছে।

টর্চের আলো ঘুরিয়ে চারদিক বেশ করে দেখে নিলুম। মেঝেতে কিছু ধুলো, জানলাগুলো বন্ধ। ভেতরের দিকে একটা জানলা খুলে দিতে ঘরে বেশ বাতাস খেলতে লাগল, গুমোটভাবটা কেটে গেল।

প্যাকিংকেসগুলো ছাড়া ঘরের অন্য কোনে একটা টেবিলের ওপর

ছুতোর মিস্ত্রির কয়েকটা যন্ত্রপাতি রয়েছে, আর রয়েছে খানিকটা দড়ি। দড়িটা আমার কাজে লাগবে।

আমরা এতক্ষণ কথা বলি নি। নীরবতা ভঙ্গ করে আমি বললুম, আর দেরি করে লাভ কি? এই ঘরে কাল সকাল পর্যন্ত তোমাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে হবে। তোমার মুখ অবশ্য খোলা থাকবে। তুমি কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচামেচি করলেই লোকজন এসে পড়বে। তুমি তাদের বলবে থানায় খবর দিতে। জহরনগর থানা বেশি দূর নয়। তুমি বলবে তুমি তোমার স্বামীকে আমেদাবাদ নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছিলে, এমন সময় কয়েকজন লোক গাড়ি থামিয়ে তোমার গলার নেকলেস, আঙুলের দুটো হীরের আংটি কেড়ে নিয়ে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে রেখে গেছে। তোমার স্বামীকেও ওরা গাড়ি থেকে টেনে বার করে কোথায় নিয়ে গেছে তাও তুমি জান না। তার হাতে দামী রিস্টওয়াচ ছিল। আঙুলে আংটি ছিল। পকেটে একটা ওয়ালেটে প্রায় তিন হাজার টাকা ছিল নার্সিংহোমে দেবার জন্যে। তোমার হ্যাণ্ড-ব্যাগেও দুশো টাকা ছিল।

ঠিক আছে আমরা তো আগেই এ নিয়ে আলোচনা করেছি। তুমি আমাকে হালকা মেয়ে ভেবো না, যাকগে যা করবার এবার করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে যাও। ছুঁড়িটা না কোন কাণ্ড করে বসে।

কি কাণ্ড করবে?

থানায় ফোন করতে পারে। নাও তাড়াতাড়ি কর।

আমি আর কোনো কথা না বলে হাত ও পা বাঁধবার উপযুক্ত দু' টুকরো দড়ি কেটে নিলুম তারপর চন্দ্রার কাছে এসে তার আঁচলটা খুলে দিয়ে খানিকটা ছিঁড়ে দিলুম। পিঠ ও বুকের কাছে ব্লাউসও অনেকটা ছিঁড়ে দিয়ে সহসা বেশ জোরে চন্দ্রার চোয়ালে একটা ঘুঁসি মারলুম কিন্তু ঘুঁষিটা ফসকে লাগল ওর গালে।

চন্দ্রা আর্তনাদ করে আমাকে গালাগাল দিল। ওর চোখের নিচেটা ফুলে উঠল। ও দু হাতে মুখ চেপে বসে পড়ল। আমি ওকে দাঁড় করিয়ে এবার ঠিক চোয়ালে আর একটা ঘুঁষি মারলুম। চন্দ্রা এবার পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আমি ওর মাথার চুল, শাড়ি ও সায়া এলোমেলো করে দিয়ে ওর দু হাত ও পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলুম। চন্দ্রা নিশ্বাস নিচ্ছিল, মনে হল নিশ্বাস নিতে ওর কষ্ট হচ্ছে তবে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।

আমি আর দেরি করলুম না। টর্চের আলো ঘুরিয়ে চারদিক একবার দেখে নিলুম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। চন্দ্রাকে এভাবে ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু সে কষ্ট আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বাংলো থেকে বেরিয়ে এলুম!

আমার পকেটে একটা ফলস গোঁফ ছিল, সেটা নাকের ডগায় লাগিয়ে নিলুম। একজোড়া চশমা ছিল, সেটাও চোখে লাগিয়ে নিলুম, তারপর হাঁটতে হাঁটতে এসে হাইওয়েতে দাঁড়ালুম।

ঘড়ি দেখলুম। রনোলি থেকে বরোদার লাস্ট বাস চলে গেছে। কোনো ট্রাকে বা কারো গাড়িতে উঠতে হবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা অটো-রিকশা আসছিল। একজন মাত্র প্যাসেঞ্জার। হাত দেখাতে থামল। বরোদা যাচ্ছে, আমি উঠে পড়লুম। যে সারভিস স্টেশনে আমার বিউইক গাড়ি ছিল আমি সেই স্টেশনে নেমে পড়লুম. তারপর গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরলুম।

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, শুধু সুমতির ঘরে আলো জ্বলছে।

কোলাপসিবল গেটে তালা লাগানো ছিল। আমার কাছে ডুপলিকেট চাবি ছিল। তালা খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকলুম।

আমি তখনো রীতিমতো উত্তেজিত। কপালের দুপাশ দপদপ করছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। ভেতরে ঘাম দিচ্ছে।

স্নান করে এসে সিগারেট ধরালুম। পাখাটা জোর করে দিয়ে ইজি-চেয়ারে বসলুম। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর তাক ফিরিয়ে আনা যাবে না। এখন কোন ঝামেলা না হলেই মঙ্গল।

শুতে যাচ্ছি ফোন বেজে উঠল। না, পুলিস নয়। সুমতি তার ঘর থেকে ফোন করছে।

এতক্ষণ কোথায় ছিলে? চন্দ্রাদিও তো এখনও ফিরল না, রাত্রি দুটো বেজে গেল, চন্দ্রাদি কোথায় গেল?

নিজের ঘড়ি দেখলুম, সত্যিই তো ছুটো বেজে গেছে, এতই অন্যমনস্ক ছিলুম যে ক্লকটাওয়ারের ঘড়ির আওয়াজও শুনতে পাই নি।

মিসেস শা কোথায় আর যাবেন? হয়ত নার্সিং হোমেই রয়ে গেছেন। কাল সকালে ফিরবেন, তুমি শুয়ে পড়, চিন্তা করতে হবে না।

কে জানে হয়ত কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, আমার ভাল মনে হচ্ছে না, তুমি থানায় ফোন কর। চন্দ্রাদি বলেছিল যত রাত্তির হোক তিনি ফিরে আসবেন।

বিরক্ত হয়ে বললুম, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো, চন্দ্রাদি তোমারও কেউ নয় আমারও কেউ নয়, তার জন্যে তোমার এত চিন্তা কেন? সে তুখোড় মেয়ে, নিজেকে সামলাতে জানে। তাছাড়া একশ মাইল পথ যাবে আবার ফিরে আসবে। বেরিয়েছে রাত দশটায় এখনও ফেরার সময় আছে, তুমি ঘুমোয় তো!

একটা কাজ কর না, আমেদাবাদে নার্সিংহোমে ফোন কর না? মিঃ শাকে নিয়ে চন্দ্রাদি পৌঁছল কি না সে খবরটা তো জানা যাবে। আমার মনে হচ্ছে কোন বিপদ ঘটেছে।

তা অবশ্য করা যেতে পারে।

আমি তো মনে মনে জানি কি হয়েছে, তবুও সুমতির জন্যে আমি আমেদাবাদে নার্সিংহোমে ফোন করলুম। তারা বলল, মিঃ শায়ের জন্যে তাঁরা অপেক্ষা করছেন কিন্তু তিনি এখনও এখানে এসে পৌঁছন নি।

সুমতি শুনে বলল, দেখলে? পথে নিশ্চয় কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। তুমি থানায় ফোন কর।

থানায় যেচে কোনো খবর দিতে আমার মোটেই সাহস হচ্ছিল না। থানার নাম শুনে আমি ভেতরে ভেতরে ঘামছিলুম। অথচ সুমতিকে সন্দেহমুক্ত রাখতে হবে। সে নিজেও পুলিসে খবর দিতে পারে। অতএব পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রইল না।

ফোন নামিয়ে রেখে সুমতি আমার ঘরে এল, পরনে চানিয়া, গায়ে ছোট ব্লাউস। আমার খাটের একধারে বসে জিজ্ঞাসা করল, থানাকে ডেকেছ?

এই যে ডাকছি।

থানার সঙ্গে লাইন যোগাযোগ হল। ওপার থেকে কর্কশ কণ্ঠে একজন বলল, বরোদা পুলিস হেডকোয়ার্টার, কি চাই ?

আমি সংক্ষেপে ঘটনা জানালুম।

হিমতভাই শা হয়ত মাতাল, অনেক টাকা তার ঋণ তবুও সে একজন নামী ব্যক্তি। আর কেউ না হলেও পুলিস তাকে এখনও গুরুত্ব দেয়। পুলিস হয়ত এককালে তার বদান্যতা লাভ করেছিল।

আমি ভেবেছিলুম পুলিস হয়ত বলবে এতরাত্রে কি আর করা যাবে ? আচ্ছা ঠিক আছে আমরা হাসপাতালগুলোতে চেক করছি, আর খোঁজ করছি কোনো অ্যাকসিডেন্ট রিপোর্ট আছে কি না, তারপর কাল সকালে দেখা যাবে।

আমার রিপোর্ট শুনে থানা বলল, একটু ধরুন।

বোধহয় কারও সঙ্গে পরামর্শ করল। তারপর বলল, একজন সাব-ইনস্পেক্টর আর একজন সার্জেন্ট যাচ্ছে।

ফোন নামিয়ে রেখে সুমতিকে বললুম, যাও শাড়ি বা কোনো পোশাক পরে এস, পুলিস অসছে।

আধঘণ্টার মধ্যেই একটা লাল মোটরবাইকে দুজন পুলিস এসে হাজির। একজন বলল, আমার নাম লেখরাজ, আর এ হল সার্জেন্ট সৈয়দ আজম, তমারুন নাম শুঁছে ! তোমার নাম কি ?

আমি আমার নাম বলে পরিচয় দিলুম। সুমতিরও পরিচয় দিলুম এবং আমরা বাড়িতে কি কাজ করি তাও বললুম। আমরা এ বাড়িতে নতুন, সুমতি তো মাত্র সাত আট দিন এসেছে।

এত বড় বাড়িতে আর কোনো লোক নেই ?

সকালে দু'জন মালি আসে, আর আসে দু'জন জমাদার। তারা ঘরদোর ঝাঁটপাট দিয়ে ঝেড়েমুছে দিয়ে চলে যায়।

তাহলে এত বড় বাড়িতে কর্তা গিন্নি আর তোমরা দু'জন সারাদিন রাত্রি থাক ? অদ্ভুত ত !

সুমতি কফি করে এনেছিল। কাপে চুমুক দিয়ে লেখরাজ বলল,

আসবার আগে আমরা হাসপাতাল ও কয়েকটা থানায় চেক করেছি, কোনো অ্যাকসিডেন্ট রিপোর্ট নেই।

লেখরাজ এবং মাঝে মাঝে আজম আমাদের অনেক প্রশ্ন করল। লেখরাজ বলল, তোমরা বলছ মিঃ শা অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, মিসেস শা তাঁকে আমেদাবাদে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছেন, যেন বরোদায় কোনো নার্সিংহোম নেই। অথচ আমরা জানি মিঃ শায়ের প্রচুর টাকা ঋণ আছে এবং বর্তমানে তিনি নতুন একটা কাজ নিয়ে নাকি বম্বে গেছেন, আর এখন শুনলুম তাদের পাওয়া যাচ্ছে না। হাইলি সাসপিসাস।

আমি বলি, মিঃ শা বম্বে গেছেন? এমন কথা ত আমরা শুনি নি।

বেশ মিঃ শা বম্বে যান নি, অসুস্থ তাই চিকিৎসার জন্যে আমেদাবাদ গেছেন। তাঁর ডাক্তার কে?

সর্বনাশ! ডাক্তারের কথা ত আমরা ভাবি নি। তবুও আমি সামলে নিয়ে বললুম, দেখুন আমরা সামান্য কর্মচারী, তায় নতুন, যতদূর জানি কোনো ডাক্তার আসত না, মিসেস শা আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন হয়ত। তবে আমি যতদূর শুনেছি যে মিঃ শা ভীষণ খিটখিটে হয়ে পড়েছিলেন এবং বরোদার কোনো ডাক্তারের ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

হুঁ। মিস পারেখ আপনি মিঃ শাকে যেতে দেখেছেন, মিসেস শাকেও দেখেছেন। কার পরণে কি পোশাক ছিল বলুন ত?

সুমতি বলল।

বাঃ তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তি ত বেশ প্রখর। পুলিসে চাকরি নিলে নাম করতে পারবে। আচ্ছা মিস সত্যি করে বল ত মিঃ শাকে দেখে ত খুব অসুস্থ বলে মনে হচ্ছিল, নাকি তিনি ভান করছিলেন?

ভান করবেন কেন? তিনি সত্যিই খুব অসুস্থ, চলতে কষ্ট হচ্ছিল।

হুঁ। চল হে আজম আমরা মিঃ শা, মিসেস শা এবং সমস্ত বাড়িটা একবার দেখে আসি।

আমি বুঝতে পারলুম যে লেখরাজ ও আজম সন্দেহ করছে যে পাওনাদারদের ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে হিমতভাই শা ও তার পত্নী দুজনেই পালিয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার তো পুলিস জানে না। জানতে না পারলেই মঙ্গল।

কোনো ঘরেই সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। চন্দ্রার ঘরে তার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে কিছু কুঁচোকাঁচা সোনার গয়না ও শ' চারেক টাকা ছিল।

সব ঘর দেখে ওরা নিচে নেমে এল। লেখরাজ বলল, সন্দেহ করার মতো আমরা কিছুই পেলুম না, ঠিক আছে আমরা আমাদের পেট্রলকে সতর্ক করে দেবো।

তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপাততঃ এই বাড়িতে তোমরা দুজন আছ? ট ইয়ং পিপল। গুড নাইট বলে আমার ও সুমতির দিকে ইঙ্গিত পূর্ণ দৃষ্টি হেনে আজমকে ডেকে নিয়ে মোটর বাইকে উঠে চলে গেল।

বাবা বাঁচলুম, বলে সুমতি পরনের শাড়িখানা খুলে পাট করতে করতে বলল, ভাগ্যিস আমাকে বেশি জেরা করে নি।

আমি বললুম, এই ত সবে শুরু, পুলিস অতি সাংঘাতিক চিজ, আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, পুলিস ছুঁলে আঠার ঘা, মজা টের পাবে, এখন যাও ঘুমোও গে, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

সত্যি ওরা গেল কোথায়? আমার মনে হয় পথে যেতে যেতে মিঃ শা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ওঁকে নিয়ে চন্দ্রাদি এমন কোন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন যেখানে টেলিফোন নেই কিংবা পথে কোথাও হয়ত গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, ইস তুমি বিরক্ত হচ্ছ, আমি চললুম কিন্তু একটা কিস্।

সুমতি চলে গেল। আমি শুয়ে পড়লুম কিন্তু বাকি রাত্রিটা ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে ভোর হতে না হতেই উঠে পড়লুম। স্নান করে দাড়ি কামিয়ে বাইরে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলুম কিন্তু কোথায় যাব তা ত জানি না।

আটটার সময় সুমতি আমাকে বারান্দায় ডাকল। কিছু খাবার ও চা তৈরি করেছে। সুমতিও ঘুমোতে পারে নি। তারও চিন্তা মানুষ দুটো গেল কোথায়?

ঘরের কিছু কাজ সেরে বেলা ন'টার সময় বলল, থানায়, একবার খবর নাও না।

খবর থাকলে ওরা জানাবে।

তা হোক তবুও তুমি একবার খবর নাও।

ফোন করলুম। থানায় লেখরাজ বা আজম নেই। যে ফোন ধরেছিল সে বলল ওরা ফিরে এলে ফোন করতে বলবে।

আমি ভাবলুম ওরা হয়ত পথে খুঁজতে বেরিয়েছে। চন্দ্রা এতক্ষণে নিশ্চয় চেঁচামেচি করে লোক জড় করেছে। থানায় খবর চলে গেছে। কে জানে লেখরাজ ও আজম হয়ত সেখানেই গেছে এবং চন্দ্রার জবানবন্দী শুনছে।

আমি ভাবলুম হিম্মতভাইয়ের অ্যাটর্নি রোহিত মেটাকে নিরুদ্দেশের খবরটা দিয়ে রাখা ভাল। রোহিত মেটাকে ফোন করলুম। পুলিসকে যা বলেছিলুম ওকেও তাই বললুম। রোহিত মেটা অবাক। পুলিসে খবর দিয়েছি সে কথাও বললুম।

রোহিত বলল বরোদার পুলিস চিফ তার বন্ধু, তার সঙ্গে সে যোগাযোগ করবে ইতিমধ্যে যদি খবরের কাগজের লোক আসে আমি যেন তাদের কাছে মুখ না খুলি, তাদের যেন রোহিতের কাছে পাঠিয়ে দিই।

রিসিভার নামিয়ে রাখতেই দেখি সুমতি এসেছে। বিমর্ষ। বলল, অসিত আমার এখানে ভাল লাগছে না, আমি আজ দুপুরে বাড়ি চলে যাব। সত্যিই আমার কি। ওরা বড়লোক ওদের ভাবনা ওরা ভাববে।

না সুমতি তোমার এখন যাওয়া চলবে না, কারণ পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিস তোমাকে আরও প্রশ্ন করবে। চন্দ্রাদি ফিরে এসে তোমাকে চাইবে হয়ত। তোমার অবস্থা আমি বুঝছি কিন্তু চন্দ্রাদি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

আমার ভয় করছে।

অতবড় বাড়িতে একা তোমার ভয় করবেই তো। তুমি এক কাজ কর, আমার পাশের ঘরে চলে এস। আমরা বরঞ্চ বাড়িটা বন্ধ করে রাখি।

বেশ আমি তোমার পাশের ঘরে উঠে আসছি কিন্তু খবরদার কোনো সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে না। সুমতি চোখ মটকালো।

কথাটা তুমিও মনে রেখ সুমতি।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলুম।

চল সুমতি তোমার জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে আসি।

আমি ওঠবার উপক্রম করছি আর সেই সময়ে মোটরবাইকের আওয়াজ শুনলুম। লাল মোটরবাইকে চেপে গেট দিয়ে লেখরাজ আর আজম ঢুকছে। দুজনকেই ক্লান্ত মনে হল।

ওরা একা কেন? চন্দ্রা কোথায়? আমি নারভাস হয়ে গেলুম। লেখরাজ বলল, রনোলিতে ওদের রোলসরয়েস গাড়িখানা পাওয়া গেছে কিন্তু ওরা গেল কোথায়? কোনো পাত্তাই নেই। অদ্ভুত ব্যাপার।

তাহলে চন্দ্রার কি হল? সেই বাংলোর কাছাকাছি কি কোনো মানুষ যায় না? চন্দ্রা কি এখনও উদ্ধারের আশায় অপেক্ষা করছে?

লেখরাজ বলল, দুজন সিকিউরিটি পুলিস রাস্তায় ডিউটি দেবার সময় ওদের কাল রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ দেখেছিল। তারপর আজ তাদের গাড়ি পাওয়া গেল। কিন্তু ওরা পালাবে কোথায়? দুজনেই নামকরা মানুষ, সকলে ওদের চেনে তবুও আমরা রেলস্টেশন, বাসস্টেশন আর এয়ারপোর্ট খোঁজ করছি। মিঃ শা সত্যিই খুব অসুস্থ ছিল?

কি করে বলব বলুম, আমি তো ডাক্তার নই। তবে ওঁর ঘরে যখনি গেছি দেখেছি আচ্ছন্নের মতো শুয়ে আছেন।

ঠিক আছে, খবরটা দিয়ে গেলুম। আমরা তদন্ত চালাচ্ছি।

ওরা দুজনে চলে গেল। এদিকে বেলা বাড়তে লাগল কিন্তু চন্দ্রার কোনো খবর নেই। সন্ধ্যাবেলায় আকাশবাণীর স্থানীয় খবরে ওদের নিরুদ্দেশের খবর প্রচার করা হল।

আধঘণ্টার মধ্যে গুজরাটী খবরের কাগজ সন্দেশের একজন নাছোড়বান্দা রিপোর্টার এসে হাজির। অনেক কষ্টে তাকে বিদায় করলুম, বললুম রোহিত মেটার সঙ্গে দেখা করতে।

সন্ধ্যা আটটা আন্দাজ সময়ে রোহিত মেটা টেলিফোন করল। সে সন্দেহ প্রকাশ করল ওদের দুজনকে কোনো বড় দস্যুদল কিডন্যাপ করেছে। শিগগির তারা ওদের মুক্তির বিনিময়ে মোটা টাকা দাবি করবে। আমি যেন টেলিফোন ছেড়ে কোথাও না যাই। রোহিত মেটা বলল সে কাল সকালে আসবে। ইতিমধ্যে আমি আর সুমতি দুজনে মিলে হিমতভাইয়ের পাওনাদারদের সমস্ত বিল ও হ্যাণ্ডনোট ইত্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র

একজায়গায় করে রাখি। রোহিত মেটার সঙ্গে সেলিম আলিও আসবে। সেলিম কোথা থেকে খবর পেয়েই রোহিতকে ফোন করেছিল।

বুঝলুম আমার চারদিকে জাল ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে। জাল থেকে বেরোবার রাস্তাগুলো ঠিক রাখতে হবে।

চন্দ্রার কোনো খবর নেই কেন? রনোলিতে সেই বাংলোয় গিয়ে দেখে আসা দরকার। ঝুঁকি নিতেই হবে। এখনই গেলে ভাল হয়। দিনের বেলায় সেখানে যাওয়া অসম্ভব। সুমতিকে লুকিয়ে যেতে হবে। নইলে সে হয়ত সঙ্গে যেতে চাইবে। বলবে একা বাড়িতে ভয় করছে।

সুমতি কিচেনে ব্যস্ত আছে। আমি এই ফাঁকে চন্দ্রার ঘরে ঢুকলুম, তার টেবিলে স্লিপিং ট্যাবলেট দেখেছিলম। আমি গোটাকয়েক সংগ্রহ করে ফিরে আসবার সময় বললুম সুমতিকে—চা খেলে কেমন হয়?

ভালই হয়।

তাহলে দু' কাপ চা করে নিয়ে আমার ঘরে এস।

আমি আমার ঘরে ফিরে এলুম। একটু পরে সুমতি ছোট একটা থালায় বসিয়ে দু কাপ চা নিয়ে এল। একটা কাপ আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি চুমুক দিতে না দিতে বললুম, এঃ মিষ্টি হয় নি, চিনি দাও নি বোধহয়।

অন্যমনস্কতার জন্যে সুমতি সত্যিই চিনি দিতে ভুলে গিয়েছিল তবুও চিনি দিলেও তাকে আমি চিনি আনতে পাঠাতুম। সুমতি চিনি আনতে গেল আর আমি সেই ফাঁকে দুটো ঘুমের বড়ি ওর চায়ের সঙ্গে গুলে দিলুম।

সুমতি চিনি নিয়ে ফিরে এল। আমি সিগারেট ধরালুম। চা খাওয়া শেষ হলে সুমতি আমাকে প্রশ্ন করল এমন কোনো সিগারেট নেই যা টানলে ঘুম পায়? দু রাত্তির ঘুমোই নি, অথচ ঘুম ঠিক আসছে না।

আমি বললুম, সিগারেট টানতে হবে না, তুমি খাটে শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে এমন একটা মন্ত্র পড়ব যে দশ মিনিটের মধ্যে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে।

না মশাই আমাকে ঘুম পাড়ানো অত সোজা নয়, আচ্ছা তবুও দেখি। কিন্তু খবরদার মশাই সাবধান আপনার হাত যেন মাথা ছেড়ে অন্য কোথাও না যায়।

না যাবে না, তুমি শুয়ে পড়।

সুমতি আমার বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমি একটা বাংলা ছড়া বলতে বলতে ওর মাথায় বিলি কাটতে লাগলুম। পাঁচ মিনিট পরে হাই তুলে সুমতি বলল, সত্যিই ঘুম পাচ্ছে গো, মন্ত্রটা আমাকে শিখিয়ে দিয়ো তো।

আমাকে বেশিক্ষণ ছড়া বলতে হল না। সুমতি ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও বেরিয়ে পড়লুম। দরজা বন্ধ করে দিলুম। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে কোলাপসিবল গেটে তালা লাগিয়ে দিলুম।

বিউইক গাড়ি চালিয়ে রনোলির রাস্তা ধরলুম। ব্র্যাঞ্চ রোড থেকে যে কাঁচা রাস্তা রনোলির দিকে গেছে আমি সেই মোড় থেকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলুম। একজায়গায় একটা অয়েল ট্যাংকার খারাপ হয়ে পড়ে আছে। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আমি গাড়িখানা রাখলুম তারপর হেঁটে সেই বাংলোয় এলুম।

গতকাল ফটকটা যেরকম খোলা ছিল আজও সেই রকম খোলা রয়েছে। সামনের দরজায় যে তালাটা গতকাল নকল চাবি দিয়ে খুলেছিলুম সেই তালাটা কালকের মতোই দরজায় লাগানো রয়েছে। 'মাস্টার-কি' দিয়ে আজও তালাটা খুলে ভেতরে ঢুকলুম। এটা অফিস ঘর। চন্দ্রা আছে পাশের ঘরে।

দরজা ভেজানো ছিল। বুক দুরুদুরু করতে লাগল। ঘরে ঢুকে হয়ত দেখব ফাঁকা। চন্দ্রা চিৎকার করে লোক জড়ো করার আগেই কেউ হয়ত ঘরে ঢুকেছিল এবং সুন্দরী মহিলাকে দেখে তাকে হয়ত অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

এই রকম ভাবতে ভাবতে আমি দরজা খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকে ফ্লাশ লাইট জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন আমার মুখে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুঁসি খেলুম।

একি সর্বনাশ! কাল ঠিক যেমনভাবে চন্দ্রাকে ফেলে গিয়েছিলুম, আজও সে ঠিক একইভাবে পড়ে রয়েছে। তারপর সে আর একটুও নড়েনি। বলে দিতে হল না যে চন্দ্রা মরে গেছে। বকসাররা যাকে বলে আপার কাট আমার ঘুঁসিটাও তাই হয়ে গিয়েছিল।

এখন কি হবে? সর্বনাশ হয়ে গেল, একেবারে ভরাডুবি। একটাও

পয়সা পাবার আশা ত রইলই না উলটে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব কি না কে জানে। আমার বুক এত জোরে ঢিব ঢিব করতে লাগল যে পাশে কোন মানুষ থাকলে সে সেই আওয়াজ শুনতে পেত।

সরে পড়ব ভাবছি এমন সময় বাইরে গাড়ির আওয়াজ। জানালা দিয়ে সাবধানে উঁকি মেরে দেখলুম হেডলাইট জেলে একটা পুলিস জিপ ঢুকছে বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যে আর জিপ থেকে নামছে লেখরাজ, আজম এবং আর একজন সাদা পোশাকে। তাকে আগে দেখি নি। বোধহয় পুলিস ডিটেকটিভ। সর্বনাশ। ওরা ত এই ঘরে ঢুকবে। এখন তো বাইরে যাওয়া অসম্ভব। ভাগ্যিস দেওয়ালের ধারে থাক করা প্যাকিংকেস ছিল, আমি কোনোরকমে আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম।

ওরা কাছে এসে পড়েছে। লেখরাজের গলা পেলুম। সে কাউকে, সম্ভবতঃ আজমকে বলছে সন্ধ্যায় রেডিওতে খবর শোনার পর একজন কেরলায় মহিলা থানায় ফোন করেছিলেন। তিনি কাছে একটা রোলস-রয়েস গাড়ি দেখেছেন। কাল রাত্রি এগারোটা আন্দাজ সময়ে এই বাংলোয় নাকি আলো জ্বলতে দেখেছেন, অথচ তিনি জানেন যে এই বাংলোটা খালি পড়ে আছে বিক্রি হবে।

মহিলা গাড়ির ব্যাপারটা ঠিকই বলেছেন। আলো জ্বালার ব্যাপারটা যাচাই করে দেখা যাক। কাছেই যখন গাড়ি পাওয়া গেছে তখন এই বাড়িতে কিছু ঘটে থাকতে পারে। টর্চ জ্বালো।

ওরা অপিস ঘরে ঢুকে পড়েছে। টর্চের আলো বেশ জোরালো। এই ঘরেও আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। অফিস ঘরে টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছু দেখল। আমার বুক ঢিব ঢিব করছে। কপাল ও পিঠ ঘেমে উঠেছে। যদি ধরা পড়ে যাই। না বাবা! যদি মুক্তি পাই তাহলে আর এ পথে নয়। হঠাৎ বড়লোক হতে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক।

ওরা ঘরে এসে পড়ল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করলুম, যদি ওরা আমার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়!

ঘরে ঢুকতেই তীব্র টর্চের আলো পড়ল চন্দ্রার ওপর। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ। আজম জিজ্ঞাসা করল কার লাশ?

কার আবার? ঐ মহিলার, মিসেস হিমতভাই।

বল কি ? এ তো মনে হচ্ছে খুন হয়েছে।

লেখরাজ কি দেখছিল তা আমি আড়াল থেকে অনুমান করতে পারছিলুম না। সে বলল, মুখে কালসিটের দাগ, চোয়ালেও, মনে হচ্ছে অন্ততঃ পঁচিশ ছাব্বিশ ঘণ্টা আগে খুন হয়েছে, কারণ ঘুঁসিই বোধহয় মেয়েমানুষটাকে ঘায়েল করেছে। তুমি মগনভাইকে ডাক। ওর কাছে ক্যামেরা আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোলার সরঞ্জাম আছে, আমি দেখি অফিস ঘরের টেলিফোনটা চালু আছে কি না তাহলে জহরনগর থানা আর আমাদের হেডকোয়ার্টারে ফোন করে দিই।

মগনভাই এসে ছবি তুলল, কারণ ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠেছিল। কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছে কি না জানি না। আমি তখন ঘামছি এবং আমার পা ঠক ঠক করে কাঁপছে।

কে খুন করে থাকতে পারে ? মগনভাই জিজ্ঞাসা করল। এই তার প্রথম কণ্ঠস্বর শুনলুম।

লেখরাজ বলল সম্ভবত যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা। হিমতভাই তো অসুস্থ। তাকেও হয়তো খুন করেছে, চল তো একটু খুঁজে দেখি তার বডি পাওয়া যায় কি না।

আজম জিজ্ঞাসা করল ফোন করেছিলে ?

না হে লাইন কাটা, আমরা হিমতভাইয়ের বডি খোঁজ করে গাড়ি থেকে অয়ারলেস··আজম এক কাজ কর না, তুমি গাড়িতে ফিরে গিয়ে অয়ারলেসে আগে জহরনগর থানায় ও পরে আমাদের হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দাও যে চন্দ্রা শায়ের বডি পাওয়া গেছে, আমি আর মগনভাই প্রথমে পাশের ঘর ও পরে কাছাকাছি বাড়ি দুটো আর করাতকলটা একবার দেখে আসি হিমতভাইয়ের বডি পাওয়া যায় কি না।

আজম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লেখরাজ আর মগনভাই গেল পাশের ঘরে। পাশের ঘরটা আমিও দেখি নি। ওরা আবার এ ঘরে ফিরে এল। আমি তখন রীতিমতো কাঁপছি, ঘামে জামা ভিজে গেছে। কেউ প্যাকিংবাক্সে একটা লাথি মারল। এবার বোধহয় এদিকে দেখবে। চোখ বন্ধ করে আমি ভগবানকে ডাকতে আরম্ভ করলুম।

আপাততঃ ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। ওরা নিশ্চয় ভাবল

চন্দ্রার বডি যখন সামনেই পড়ে আছে তখন হিম্মতভাইয়ের বডি লুকোতে যাবে কেন, খুনীরা সামনেই ফেলে চলে যাবে, এইজন্যে প্যাকিংবক্সের এপাশটা আর দেখল না।

একটু পরেই পায়ের আওয়াজ পেলুম। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ওরা দেখবে কম্পাউণ্ড ও তারপরে পাশের বাড়ি। এই সুযোগে আমাকে পালাতে হবে কিন্তু জিপ গাড়িতে যে আজম আছে।

তবুও আমি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগলুম। লেখরাজ ও মগনভাই কম্পাউণ্ড দেখা শেষ করে যখন গেট দিয়ে বেরিয়ে পাশে বাড়ি দুটোর দিকে যাচ্ছে তখন আমি দেখলুম আজমও ওদের দিকে আসছে, তার উদ্দেশ্য লেখরাজ ও মগনভাইয়ের সঙ্গে যোগ দেওয়া।

লেখরাজ জিজ্ঞাসা করল, খবর দিয়েছ ? দু জায়গাতেই ?

আজম বোধহয় ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিয়েছিল কারণ আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই নি।

আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে বাইরের ঘরে এসে দরজার আড়াল থেকে ওদের ওপর নজর রাখছি, নাও অর নেভার। ওরা একটা বাড়িতে ঢুকলেই আমি পালাব।

অন্ধকার। জিপ গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত গাড়িতে ড্রাইভার বা চতুর্থ কোনো ব্যক্তি নেই। লেখরাজরা যখন পাশের একটা বাড়িতে ঢুকেছে তখন আমি কম্পাউণ্ড পার হয়ে গেটের বাইরে এসে পড়েছি। পায়ের কাছ থেকে একটা ছোট ঢিল তুলে নিয়ে জিপগাড়ির দিকে ছুঁড়ে মারলুম। না কোনো সাড়া নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। রাস্তা ক্লিয়ার। আমি আমার গাড়িতে এসে উঠলুম।

বাড়ি ফিরে দেখি সুমতি আমার খাটে চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। নিশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উন্নত বক্ষযুগল ওঠানামা করছে। কিচেনে ছিল, শুধু হাউস কোট পরে ছিল, ব্রা পর্যন্ত পরে নি। বুকের অনেকটা অংশই দেখা যাচ্ছিল।

আসন্ন একটা সাংঘাতিক বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে বেশ হালকা মনে হচ্ছিল। নির্জন বাড়িতে, এমনকি একটা পোষা কুকুর পর্যন্ত নেই।

এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আমি সুমতির বুক চেপে ধরলুম, ওষ্ঠে চুম্বন করলুম তবুও তার ঘুম ভাঙল না। তখন তার হাউসকোটের বোতামগুলো খুলে সেটি তার দেহ থেকে আস্তে আস্তে খুলে দিলুম।

সুমতির ঘুম এমনই গাঢ় নইলে সে স্বপ্নে ঘুরে বেড়ায় কি করে। তার ওপর দুটো বারবিচুরেট বড়ি খাইয়েছি, ঘুমের কড়া ওষুধ। অতএব তার প্যান্টিও যখন খুলে দিলুম তখনও সে টের পেল না।

দশ মিনিট পরে আমি সুমতির পাশে শুয়ে। ইতিমধ্যে যা ঘটবার তা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটেছে তবুও সুমতির ঘুম ভাঙে নি। আমি তাকে আবার প্যান্টি ও হাউসকোট পরিয়েছি তবুও সে জেগে ওঠে নি।

আমি বাথরুম থেকে স্নান করে এলুম। ক্ষিধে পেয়েছে। সুমতিকে ডেকে তুললুম। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এল সুমতি। ইতিমধ্যে আমি টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখেছি।

সুমতিকে বললুম, কাল সকালে রোহিত মেটা আসবে, হিমতভাইয়ের পাওনাদারের বিলগুলো আর সংশ্লিষ্ট কাগজ ও চিঠি একজায়গায় করে রাখতে হবে।

সে ত আমি আগেই গুছিয়ে ব্রিফকেসে রেখে দিয়েছি, চন্দ্রাদি আমাকে একদিন হিসেব করতে বলেছিল, সেইজন্য আমি সব গুছিয়ে রেখেছি।

ব্রিফকেসটা কোথায়?

হিমতভাইয়ের স্টাডিতে আলমারির মধ্যে আছে। ব্রিফকেসে আরও কিছু কাগজপত্র আছে তবে সেগুলো আমি বার করি নি।

তাহলে তো তুমি কাজ এগিয়ে রেখেছ, কাল সকালে দেখলেই চলবে। থ্যাংক ইউ।

সুমতি এবার মিটিমিটি হাসতে হাসতে সলজ্জ কণ্ঠে আমাকে বলল, আচ্ছা আমি যখন ঘুমোচ্ছিলুম তখন তুমি কিছু করেছ, না?

তুমি কি একেবারেই টের পাও নি?

আমি স্বপ্ন দেখছিলুম।

পরদিন সকালে কিছু খেয়ে আমি আর সুমতি হিমতভাইয়ের স্টাডিতে

গিয়ে ব্রিফকেস থেকে বিলগুলো বার করলুম। চন্দ্রা নিজে একটা টোটাল দিয়ে রেখেছিল তবুও আমি বিলগুলো তারিখ অনুসারে সাজিয়ে সংখ্যা মিলিয়ে ভাল করে চেক করে নিজে আবার টোটাল দিলুম।

সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও চিঠিগুলো তারিখ অনুসারে সাজিয়ে রাখলুম। ব্রিফকেসে অন্যান্য যেসব কাগজ ছিল সেগুলো বার করলুম। সবই প্রায় অপ্রয়োজনীয় কিন্তু একখানা মুখবন্ধ খাম পাওয়া গেল তার ওপরে হিমত-ভাইয়ের নিজের হাতে লেখা আছে, রোহিত মেটার জন্যে। হিমতভাই শায়ের শেষ উইল ও স্বীকারোক্তি।

খামখানা খুলে দেখার আমার প্রবল ইচ্ছে হল কিন্তু সুমতিও ওটা দেখছে। তার সামনে খোলা ঠিক হবে না, উচিতও নয় বিশেষ করে রোহিত নিজে যখন আর একটু পরে আসছে। আমি অবহেলাভরে খামখানা রেখে দিলুম কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই ওটা সরাতে হবে। সব কাগজ-পত্তর আবার ব্রিফকেসে রেখে দিলুম। পরে সুমতি যখন ঘর থেকে কোনো কাজে একবার বেরিয়েছিল আমিও রোহিত মেটার নামে সেই খামখানা সরিয়ে নিয়েছিলুম।

দশটা বাজার কিছু পরে রোহিত মেটা এল, সঙ্গে যে লোকটি এসেছে তার বাজ পাখির মতো নাক আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখেই আমি কি রকম ঘাবড়ে গেলুম। এ লোক সাংঘাতিক। এই কি ইনসিওরেন্সের সেই বিখ্যাত পুরুষ সেলিম আলি?

ওরা গুছিয়ে বসতে না বসতে লেখরাজ আর পুলিশ কমিশনার এসে হাজির।

আমার বুকের মধ্যে কাঁপুনি আরম্ভ হল। ওরা দুজন বসল। লেখরাজ জিজ্ঞাসা করল, সেই যুবতীটি কোথায়? তাকে ডাক। আচ্ছা শোনো মিঃ চৌধুরী তুমি কি জয়ন্তীভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে?

করতুম কিন্তু কেন?

জয়ন্তীভাইকে আমরা সুনজরে দেখতুম না। কয়েকবারই তাকে গ্রেফতার করতে হয়েছিল কিন্তু বরাত জোরে সে বেরিয়ে গেছে। ঠিক আছে তুমি সেই ইয়ং গার্লটিকে ডাক।

পুলিস জয়ন্তীভাইকে সুনজরে দেখত না অতএব আমার প্রতিও তারা

কৃপা বর্ষণ করবে না। আমি রীতিমতো নারভাস হয়ে গেলুম। সুমতিও আমাকে দেখে বলল, তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন? পুলিস দেখে অত ভয় পাবার কি আছে?

হায় সুমতি তুমি যদি সব জানতে, মনে মনে বলি। তাকে বলি, চল তোমাকে সেই পুলিসই ডাকছে।

ওরা চারজন পর পর চারটে চেয়ারে বসেছে। নিজেরাই চেয়ার টেনে নিয়েছে। এটা হল বাড়ির বসবার ঘর। চেয়ার ও সোফা ইত্যাদির অভাব নেই।

সেলিম আলি আমাদের বসতে ইঙ্গিত করল। আমি বসার সঙ্গে সঙ্গে সেলিম আলি ও পুলিস কমিশনার আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

বেশির ভাগ প্রশ্ন করতে লাগল সেলিম আলি। পুলিস কমিশনার ও লেখরাজ মাঝে মাঝে।

প্রথমে সুমতিকে জেরা আরম্ভ হল। অনেক প্রশ্ন। সেলিম আলি কয়েকটা মারাত্মক প্রশ্ন করল। যেমন, মিস পারেখ হিমতভাই গাড়িতে ওঠবার সময় তুমি কি তার মুখ দেখতে পেয়েছিলে? না, সুমতি দেখতে পায় নি, টুপি নামানো ছিল, আলো কম ছিল। এর আগে তুমি কখনও হিমতভাইকে দেখেছ? না, সুমতি দেখে নি।

সেলিম আলি আমাকে প্রশ্ন করল, তোমার কি মনে হয় হিমতভাই চন্দ্রাকে খুন করতে পারে? আমি বলি গুলি করে হত্যা করা মিঃ শায়ের পক্ষে হয়তো সম্ভব ছিল কিন্তু ঘুঁসি মেরে নয় কারণ তিনি রীতিমতো অসুস্থ ছিলেন।

সত্যিই কি অসুস্থ ছিলেন?

কি করে বলি বলুন, আমি নতুন এসেছি তার ওপর আমি ডাক্তার নই।

পুলিস কমিশনার রোহিত মেটাকে একই প্রশ্ন করল। রোহিত মেটা বললেন, হিমতভাই ভীষণ ড্রিংক করত, মাতাল অবস্থায় তার পক্ষে সবই সম্ভব কিন্তু বর্তমানে সে যেরকম অসুস্থ ছিল তাতে চন্দ্রার মতো মেয়েকে বোধহয় আঘাত করা সম্ভব ছিল না। আমি জানি মেয়ে হলেও চন্দ্রার দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল। তাছাড়া চন্দ্রাকে হত্যা করার কারণ কি থাকতে পারে।

লেখরাজ বলল, আমরা সবদিক তদন্ত করছি, হিমতভাই বা তার লাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না। তাকে কেউ কিডন্যাপ করে নি কারণ তাকে কিডন্যাপ করে লাভ নেই, সকলেই জানে যে সে দেনায় ডুবে আছে। আর কিডন্যাপাররা মিছেমিছি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করতে যাবে কেন? সবই রহস্য

সেলিম আলি রোহিত মেটাকে জিজ্ঞাসা করল, চন্দ্রার অনুকুলে হিমতভাই যে মোটাটাকা ইনসিওর করেছিল এ খবর কি চন্দ্রা জানত?

জানত বৈকি এবং পরে হিমতভাই ইনসিওরেন্সের শর্ত পরিবর্তন করেছিল তাও চন্দ্রা জানত।

সেলিম আলি দুম করে বলল, এর ভেতরে নিশ্চয় একজন তৃতীয় ব্যক্তি আছে, মিঃ কমিশনার আপনারা সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে খুঁজে বার করুন, সব রহস্যের সমাধান হবে,' বলে সেলিম আলি আমার দিকেই চাইল।

পুলিস কমিশনার জিজ্ঞাসা করলেন, তৃতীয় একজন ব্যক্তি যে এই ব্যাপারে জড়িত আছে আপনার এমন সন্দেহ করার কারণ কি?

কারণ অনেক থাকতে পারে, ঐ মহিলা মানে চন্দ্রা শা আগে একটা ইনসিওরেন্স কেসে জড়িয়ে পড়েছিল। অ্যান্টনি ডিসুজা নামে তার এক গোয়ানিজ ধনী স্বামী ছিল! ডিসুজাও চন্দ্রার অনুকূলে মোটা টাকার ইনসিওরেন্স করেছিল। তারপর সেই ডি'সুজা পাঁচতলার জানালা দিয়ে নিচে পড়ে যায় ও মারা যায়। আমাদের সন্দেহ হয়, আমরা চন্দ্রাকে টাকা দিতে চাই নি। চন্দ্রা কোর্টে মামলা করে জেতে তবে পুরো টাকা পায় নি। যা পেয়েছিল তাও মোটা টাকা। আমরা জানি চন্দ্রা ডি'সুজাকে জানালা দিয়ে নিচে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে করতে সেলিম আলি বলল, মাত্র কিছুদিন আগে হিমতভাই তার ইনসিওরেন্সের পলিসিতে একটা সংশোধন করল, সে যদি আত্মহত্যা করে তাহলেও যেন তার স্ত্রী টাকা না পায়। তখনি আমার সন্দেহ হল, গোলমাল আসছে, চন্দ্রা আগে একটা খুন করেছে, এবারও টাকা পাবার জন্যে সে খুন করতে পারে এবং কোন মেয়ে যদি কাউকে খুন করতে চায় তাহলে তার একজন পুরুষ সঙ্গী চাই।

পুলিস সেলিম আলির এই থিওরি গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাদের

বিশ্বাস হিমতভাই মোটেই অসুস্থ ছিল না, ভান করে বিছানায় শুয়ে ছিল, সেই তার বউকে খুন করেছে। হয়ত খুন করার ইচ্ছে ছিল না, কোনো কারণে রাগের মাথায় বউকে ঘুঁসি মেরেছে, তাতেই বউ মরে গেছে।

সেলিম আলি একটা প্রস্তাব করল, হিমতভাই এই বাড়িতে ফিরে আসবে অথবা কোথাও না কোথাও তার ডেডবডি পাওয়া যাবে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যে পর্যন্ত তা না ঘটছে সে পর্যন্ত এই বাড়িতে দিনরাত্তির একজন পুলিস মোতায়েন করা হোক।

পুলিস কমিশনার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। শেখরাজকে বললেন, আজম আসে নি? না এসে থাকলে থানায় ফিরে গিয়ে তাকেই পাঠিয়ে দিয়ো। সে এই বাড়িতে থাকবে।

কি সর্বনাশ! এই বাড়িতে যদি একজন পুলিস চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয় তাহলে আমি ডিপফ্রিজ থেকে হিমতভাইকে বার করব কি করে? সুমতি একা থাকলে তাকে না হয় আর একবার ঘুমের বাড় খাইয়ে কাজটা করা যেত কিন্তু এখন আমি কি করি? আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

সেলিম আলি উঠে পড়ল, বলল আমি এবার যাব। পুলিস কমিশনার বললেন আমরাও যাব। রোহিত মেটা বললেন, আমিই বা বাকি থাকি কেন? অসিত তুমি কি কাগজগুলো গুছিয়ে রেখেছ?

প্রথমে আমি মিঃ মেটার কথা শুনতে পাই নি। তিনি আর একটু জোরে বলতে শুনতে পেলুম। আমি তখন নিজের বিপদ ভেবে অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিলুম।

আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসে বলি, না মিঃ মেটা সব কাগজ রেডি করতে পারি নি। দয়া করে আমাকে আর একটা দিন সময় দিন।

এই সময়ে সুমতি আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। আমি তাকে চুপ করতে ইসারা করলুম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। সুমতি আমাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করল তুমি অ্যাটর্নিকে মিছে কথা বললে কেন অসিত?

আগে হলে হয়ত বলতুম না কিন্তু দেখলুম সেলিম আলি আমাকে সন্দেহ করছে। সে ভাবছে আমি চন্দ্রার প্রেমিক, ইনসিওরেন্সের টাকার জন্যে আমার সহায়তায় চন্দ্রা তার স্বামীকে খুন করেছে। হিমতভাই আত্মহত্যা

করলে তার বউ টাকা পাবে না কিন্তু খুন হলে চন্দ্রা টাকা পাবে। সেলিম আলির বিশ্বাস হিমতভাই দেনাদারদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আত্মহত্যা করার আগেই চন্দ্রা তাকে খুন করিয়েছে। তুমি ঠিকই ধরেছিলে, চন্দ্রা আর আমি কিছুদিন প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলুম। আমরা পরস্পরে এক বিছনাতেও শুয়েছি।

যাক সে কথা, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, চন্দ্রাকে তাহলে কে খুন করল? অসিত এ বাড়িতে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

আমার অনুরোধ আর দু একটা দিন অপেক্ষা কর সুমতি। চল স্টাডিতে যাই, হিমতভাইয়ের শেষ উইলটা পড়ে দেখি। পরে ওটা অন্য খামে ভরে সীল করে খামের ওপর রোহিত মেটার নাম লিখে দিলে বা টাইপ করে দিলেই চলবে।

স্টাডিতে ঢুকে ব্রিফকেস থেকে হিমতভাইয়ের শেষ উইল খাম থেকে বার করে পড়তে লাগলুম। পৃথিবীর সব মানুষ কি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে? হিমতভাই উইলে লিখেছে, মহাজনদের ঋণ শোধ করে যদি আমার কিছু সম্পত্তি বা অর্থ বা উভয়ই উদ্বৃত্ত হয় তাহলে সেসবই পাবে আমার সেক্রেটারি অসিত চৌধুরী কারণ একদা সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

কি লেখা আছে অসিত?

পড়ে দেখ, মাতালটা আমাকে ফাঁসিয়ে গেছে, কে চায় ওর টাকা? এখন যদি এই উইল পুলিসের হাতে পড়ে তাহলে আমি কি আর ছাড়া পাব। হিমতভাই বা চন্দ্রাকে হত্যা করার একটা মোটিভ পুলিস খুঁজে পাবে, আমাকে নিশ্চিত ঝুলিয়ে দেবে। না এ কাগজ আমি অ্যাটর্নিকে দিতে পারি না।

আমি জানি না বাপু কিন্তু যা করবে তা বেশ ভেবেচিন্তে কর।

ঠিক আছে, এস আমরা খেয়ে নিই, তারপর আমি একবার ব্যাংকে যাব, আজম দারোগা একটু পরেই এসে যাবে মনে হয়।

সুমতি যখন খাবার ঠিক করতে গেল আমি সেই ফাঁকে ডিপফ্রিজের সুইচটা অফ করে দিলুম। আজম এলে ওটা ওর নজরে পড়তে পারে, ডিপফ্রিজের সুইচ অন করা কেন? কৌতূহলী হয়ে ঢাকা তুলে দেখতেও পারে।

যাইহোক আজ রাতের মধ্যেই হিমতভাইয়ের ডেডবডি ডিপফ্রিজ থেকে বার করে বাগানে বা কোথাও ফেলে রাখতে হবে। হাতে অবশ্য তার রিভলভারটা ধরিয়ে দিতে হবে এবং সে যে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে এটাও লিখে রাখতে হবে। বাড়িতে ফিরে এসে একসময় বাগানে বসে সে নিজেকে গুলি করেছে। একটা গুলির আওয়াজও করতে হবে যাতে সুমতি অন্ততঃ শুনতে পায়। পুলিসকে সে বলতে পারবে যে বাগানে সে গুলির আওয়াজ শুনেছিল।

খাওয়া সেরে আমি সুমতিকে আশ্বাস দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেয়ে বলি সব ঠিক হয়ে যাবে। ঝামেলা মিটে গেলেই আমরা বিয়ে করব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক ডালিং।

ব্যাংকে গিয়ে আমি সেফ ডিপজিট লকারের চাবি নিয়ে লকার খুলে রুমাল দিয়ে হিমতভাইয়ের রিভলভার ধরে বার করে পকেটে রাখি তারপর হিমতভাইয়ের আগেকার আত্মহত্যার কৈফিয়ত এবং শেষ উইলখানা লকারে রেখে চাবি বন্ধ করে বাড়ি ফিরে আসি।

বাড়ি ফিরে এসে দেখি আজম দারোগা এসে গেছে। আজম বেশ সুদর্শন যুবক, চেহারাটা আকর্ষণীয়, ফিলমের হিরোর মতো। বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে বসে ডিটেকটিভ বই পড়ছিল।

সুমতি নিজের ঘরে শুয়েছিল। আমাকে দেখে বলল, দারোগা এসে গেছে। আচ্ছা ডিপফ্রিজের সুইচ কি তুমি অফ করেছ ?

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মোটরকে বিশ্রাম দিতে হয়, আগেও ত করেছি তুমি বোধহয় লক্ষ্য কর নি।

পোশাক বদলে আজমের সঙ্গে আলাপ করবার উদ্দেশ্যে বারান্দায় যাবার সময় দেখি সে কখন বই ছেড়ে উঠে এসে কোমরে দুই হাত দিয়ে ডিপফ্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বনাশ!

আমাকে দেখে বলল, এই যে তুমি ফিরে এসেছ শুনলুম ব্যাংকে না কোথায় গিয়েছিল।

হ্যাঁ এখনি ফিরলুম। আমার তো তখন হয়ে গেছে। আজম এই বুঝি ডিপফ্রিজের ডালা খুলে দেখে। কথা বললুম বটে কিন্তু যেন আমার গলা দিয়ে নয়।

আজম বলল এইরকম একটা ডিপফ্রিজ থাকলে মন্দ হয় না।

অতবড় ফ্রিজ নিয়ে তুমি কি করবে, ওগুলো হোটেলের উপযোগী, ছোট সাইজেরও পাওয়া যায়।

তাই বুঝি, কিন্তু জিনিসটা দারুণ।

আজমকে এখান থেকে এখুনি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। তাই ওকে বললুম, আমার সহকর্মী মিস সুমতি পারেখের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

না তো, সেদিন মানে কাল দেখেছি, দি গার্ল ইজ লাভলি অ্যাণ্ড সেকসি টু।

এই মরেছে। মনে মনে বিপদ গণি। সুমতির সঙ্গে কিছু না করে। সুমতিও হয়ত পুলিসের ভয়ে কিছু বলতে পারবে না। যাইহোক আপাততঃ বিপদ থেকে তো বাঁচি।

আজমকে ওখান থেকে সরিয়ে এনে সুমতিকে ডেকে আনি। সুমতি তখন জিন পরে বরোদার বাজারে কিছু সওদা করতে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। টাইট ফিটিং জিন পরায় সুমতিকে সত্যিই সেকসি দেখাচ্ছিল।

আজম যেন সুমতিকে লুফে নিল। তাকে নিয়ে কি করবে, কোথায় বসাবে যেন ভেবে পাচ্ছে না। আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হলুম। সুমতি এখন আমাকে আয়ত্বে রাখতে পারবে। আজম আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। অবশ্য সুমতির সহযোগিতা দরকার। আজমের চেহারাটা তো ভাল। সুমতি ওর দলে ভিড়ে যেতেও পারে।

তোমরা গল্প কর সুমতি, আমাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে, আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি তারপর তুমি না হয় বাজারে যেও।

ঠিক আছে বলে সুমতি হেসে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপল।

হিমতভাইয়ের স্টাডিতে ঢুকে আমি দরজা বন্ধ করে টাইপরাইটারে হিমতভাইয়ের লেটারহেড পরিয়ে খটাখট করে টাইপ করলুম: আমার রিভলভারটা নিতে আমাকে আসতে হল নইলে আমি সুইসাইড করব কি করে। চন্দ্রা আর পাওনাদারদের হাত থেকে মুক্তি পাবার আমার আর কোনো উপায় নেই।

বলাবাহুল্য আমি একটা গ্লাভস পরে চিঠিখানা টাইপ করেছিলুম। তারপর চিঠিখানা হিমতভাইয়ের রাইটিং টেবিলের ড্রয়ারের ওপরেই রেখে দিলুম।

গ্লাভস খুলে বারান্দায় ফিরে এসে দেখি সুমতি আর আজম গায়ে গা ঠেকিয়ে হাত ধরধরি করে বসে আছে। ওরা দু'জনেই আমাকে দেখে শুধু একটু নীরব হাসি হাসল। আমিও হাসলুম যার অর্থ বাঃ বেশ।

ইতিমধ্যে আমি আজমের সন্দেহ উদ্রেক না করে আরও একটা কাজ করতে পেরেছিলুম। হিমতভাইয়ের বেডরুমে ঢুকে আলমারি থেকে বুলেটের বাক্স বার করে একটা বুলেট বার করে এনে পকেটে রেখেছিলুম। এই বুলেটটা পরে কাজে লাগবে।

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। গুমোট গরম। রাত্রে বৃষ্টি হতে পারে। আমি, সুমতি ও আজম বারান্দায় বসে গল্প করছি। সুমতি মাঝখানে। আমি মনে মনে ভাবছি আজমকে কি করে ঘুমের বড়ি খাওয়ানো যায়। আজম যেন এই ডিউটিটা পেয়ে বর্তে গেছে। সে সুমতিকে নিয়ে বেশ মজাসে আছে। সুমতিও লক্ষ্য করছি আজমের দিকে ঝুঁকেছে। তাই ঝুঁকুক, তাহলে আমার কাজের সুবিধে হয়!

আমি ভেবেছিলুম আজম বুঝি সারা বাড়িটায় টহল দেবে, প্রশ্ন করে আমাকে ও সুমতিকে উত্যক্ত করবে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ও যেন আমার ও সুমতির বন্ধু, ছুটি কাটাতে আমাদের বাড়িতে এসেছে। আজম সুমতিকে পেয়ে বসেছে। সুমতি যেখানে যাচ্ছে আজমও সেখানে যাচ্ছে। এমন কি কিচেনে গিয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে, বাসন ধুচ্ছে, সুমতিও ওকে হুকুম করছে।

দশটা বাজার পর আমরা আবার বারান্দায় এসে বসলুম।

আমি আর আজম সিগারেট ধরালুম, তাই দেখে সুমতিও একটা চাইল। বেশ গুমোট গরম। ট্রানজিস্টর রেডিও বাজছিল। বিবিধ ভারতীর সঙ্গীতানুষ্ঠান চলছিল। সেই অনুষ্ঠান শেষ হতেই সুমতি বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি শুতে চললুম।

আজম সায়েব তুমি কোথায় ঘুমোবে? আমি জিজ্ঞাসা করি। সে বলল, এই বারান্দাতেই সে শোবে, ঐ তো একটা ডিভান রয়েছে, পাখাও রয়েছে। মেঘ ডাকছে, বৃষ্টি এলো বলে।

আমি মনে মনে প্রমাদ গণি। আজম বারান্দায় শুলে আমার কাজে

অসুবিধা। আচ্ছা দেখি ত আজম টোপ গেলে কি না। আমি প্রস্তাব করি, আজম একটু হুইস্কি খাবে, ভাল সরবত আছে, তার সঙ্গে মিশিয়ে দিই? খাবে?

মন্দ বল নি। তুমিও খাবে ত? সুমতি?

হ্যাঁ আমরা তিনজনেই খাব, তুমি বোসো, আমি তৈরি করে আনি।

তিন গেলাস সরবত তৈরি করে এনে দেখি আজম জামা প্যান্ট খুলে শুধু জাঙিয়া পরে বসে আছে। বলা বাহুল্য তার গেলাসে একটা ঘুমের বড়ি মিশিয়ে দিয়েছি, দুটো দিলে পরে ওর বা পুলিসের সন্দেহ হতে পারে, এত ঘুম কেন? সুমতির গেলাসে মেশাই নি কারণ তাকে তো গুলির আওয়াজ শুনতে হবে। তার সরবতটা' তার ঘরে দিয়ে এলুম সে তখন নাইটি পরে চুল আঁচড়াচ্ছিল।

সুমতিকে সরবতের গেলাসটা দিয়ে একটা চুমো খেয়ে বললুম, সাবধান সুমতি, ক্ষুধার্ত বাঘটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাঘটা তোমার ঘরে আসতে পারে।

এলেই বা, অমন বাঘকে আমি ভয় করি না, কি করে বস করতে হয় জানি, অনেক বাঘের সঙ্গে খেলা করেছি।

মনে মনে বলি, তাই খেল তুমি সুমতি, আমার কাজটা আমি তাহলে নির্বিঘ্নে করতে পারব।

বারান্দায় ফিরে এলুম। অন্ধকারেও আজম উজ্জ্বল, ভীষণ ফর্সা, বোধহয় খানদানি বংশের ছেলে। সিনেমা লাইনে গেলে নাম করতে পারবে।

সরবত খাওয়া শেষ হলে আমি বললুম, আজম সায়েব তুমি তাহলে শুয়ে পড়, আমি একটু স্নান করে আসি।

ঠিক আছে আমার জন্যে ভেবো না।

স্নান করে এসে দেখি বারান্দায় আজম নেই। আমার সন্দেহ হল ও নিশ্চয় সুমতির ঘরে ঢুকেছে। সুমতির ঘরের পাশেই তো আমার ঘর। সুমতির ঘরের দরজায় কান পাতি। হ্যাঁ, আমার অনুমান ঠিক। দুজনে কথা বলছে।

আমি আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। একটু পরে মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

রাত্রি দেড়টার সময় বৃষ্টি কমল। আমি উঠলুম। আজম কি করছে

একবার দেখা দরকার। সুমতির দরজায় টোকা মারলুম। কোনো সাড়া নেই। দরজা ঠেলতে খুলে গেল। টর্চ জ্বাললুম। আজম ও সুমতি দুজনেই নিরাবরণ পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আজম ঘুমের বড়ি খেয়েছে আর সুমতি ক্লান্ত এবং বৃষ্টি হয়ে ঠাণ্ডাও হয়েছে। ওরা এখন ঘুমোবে কিন্তু এত ঘুমোলে সুমতি কি গুলির আওয়াজ শুনতে পাবে ?

আগে আমার কাজ সেরে আসি তারপর দেখা যাবে। আমি ডিপ-ফ্রিজের কাছে গেলুম। ফ্রিজের ওপর থেকে বোতলগুলো সরিয়ে পাশে টেবিলে রাখলুম। ডালা তুললুম। হিমতভাই শুয়ে আছে। পোশাক ভিজে ভিজে। তা তো হতেই পারে। ভালই হল। সে তো বাইরে থেকে এসে সুইসাইড করবে অতএব পোশাক ভিজতে পারে।

একটা ছোট আলো জ্বেলে ওকে তুললুম। ফ্রিজের সুইচ তো আগেই বন্ধ করে দিযেছিলুম। অতএব হিমতভাইযের আহত স্থান থেকে রক্ত পড়তে আরম্ভ করেছিল। ফ্রিজ থেকে ওকে বার করবার পর লক্ষ্য করলুম, ফ্রিজের ভেতরেও কিছু রক্ত পড়েছে। ওটুকু মুছে নিতে হবে।

হিমতভাইকে কাঁধে ফেলে ওর স্টাডিতে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে শার্সি কাঁপিয়ে জোরে একটা বাজ পড়ল।

হিমতভাই যেদিন সুইসাইড করেছিল সেদিন যে ভাবে বসেছিল তাকে সেইভাবে বসিয়ে দিয়ে তাকে তারই রিভলভারে বুলেট লাগিয়ে খোলা জানালা দিয়ে ফায়ার করে রিভালভারটি বেশ করে মুছে হিমতভাইয়ের হাতে ঠিকভাবে ধরিয়ে দিলুম। টাইপকরা চিঠিখানা টেবিলের ওপর রেখে দিলুম।

ঘরের বাইরে এসে যখন দাঁড়িয়েছি তখন দেখি দূরে সুমতি দাঁড়িয়ে, একটা বড় তোয়ালে দিয়ে দেহ আবৃত। আমাকে দেখে বলল, বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারপরেই যেন গুলির আওয়াজ শুনলুম, ব্যাপার কি ?

ব্যাপার গুরুতর। বৃষ্টির সময় কখন হিমতভাই এসে তার স্টাডিতে বসে এইমাত্র আত্মহত্যা করল, কিন্তু আজম কোথায় ? সে জেগে পাহারা দিলে এমন শোচনীয় কাণ্ড হয়ত ঘটত না। আমি পুলিসে ফোন করি।

দাঁড়াও, আজম আমার ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, তুমি পুলিসে ফোন করলে বেচারা বিপদে পড়বে, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি, ওর জামা প্যান্ট কোথায় ?

ঐ তো ডিভানের ওপর পড়ে আছে, নিয়ে যাও।

একটু পরে আজম কোনরকমে জামা প্যান্ট পরে ধড়মড়িয়ে ছুটে এল। ও আর একটু আগে এলে আমি অসুবিধেয় পড়তুম। কারণ আমি যখন হিমতভাইকে ডিপফ্রিজ থেকে বার করে স্টাডিতে নিয়ে যাচ্ছিলুম সেই সময়ে আমার পাজামায় কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল। আমি দ্রুত পাজামাটা ছেড়ে আর একটা পাজামা পরে নিতে পেরেছিলুম।

আজম যখন স্টাডিতে হিমতভাইকে দেখে এবং পুলিসকে ফোন করতে ব্যস্ত ছিল আমি সেই সময়ের মধ্যে ডিপফ্রিজে রক্তের ফোঁটাগুলো মুছে নিয়েছিলুম। তারপর ঐ রক্তমোছা ন্যাকড়া, রক্তলাগা আমার পাজামা আর যে গ্লাভস পরে টাইপ করেছিলুম, রিভলভার ধরে গুলি করেছিলুম, সেই গ্লাভসজোড়া এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলুম। সুমতিও তখন বাথরুমে ছিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে হেডকোয়ার্টার থেকে লেখরাজ, মগনভাই, ডাক্তার ও মার্ডার স্কোয়াডের লোকজন ও একখানা অ্যামবুল্যান্স এসে গেল। তারা সকলে এক সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে দিল। আমি আর সুমতি একটা সোফায় পাশাপাশি বসে আছি, ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছি, শুনছি।

পুলিসের মোটামুটি ধারণা আমেদাবাদ স্যানোটোরিয়মের পথে যেতে যেতে হিমতভাই ও চন্দ্রা কোনো কারণে ঝগড়া করেছিল তারপর হিমত-ভাই চন্দ্রাকে ঐ বাংলোয় নিয়ে গিয়ে হত্যা করে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু সফল না হয়ে বাড়িতে ফিরে এসে আত্মহত্যা করে। পুলিস আর ঝামেলা বাড়াতে চায় না। এইখানেই কেস বন্ধ করে দিতে চায়।

আমি আর সুমতি লক্ষ্য করলুম রোগাটে ল্যাকপেকে মতো একজন লোক পায়চারি করছে, এদিক ওদিক উঁকি মেরে দেখছে। খবরের কাগজের রিপোর্টার নাকি ? তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, না আমি রিপোর্টার নই, আমি ইনসিওরেন্স কোম্পানির ডিটেকটিভ। আমার নাম মোতিরাম।

আমি সেলিম আলির জন্যে অপেক্ষা করছি, সে সাতটার সময় আসবে, তাকে রিপোর্ট দিতে হবে।

পুলিসের অনুমান শুনে আমি নিশ্চিত হয়েছিলুম। ভেবেছিলুম ইনসিওরেন্স কোম্পানি পুলিসের রিপোর্ট গ্রহণ করবে আর তাছাড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাউকে টাকা দিতে হচ্ছে না তো। কিন্তু মোতিরাম বলল পুলিসের রিপোর্ট যাই হোক সেলিম আলি নাছোড়বান্দা, সে সব কিছু শেষ পর্যন্ত খতিয়ে দেখবে। শুনেই তো আমি ঘামতে লাগলুম, সুমতিকে কাছে টেনে ধরলুম। সুমতি তখন আমার কানে কানে বলছিল, কাল রাত্রে আজমকে নিয়ে শুয়েছিলুম বলে তুমি রাগ করনি তো?

আমার মনের অবস্থা বুঝলে সুমতি ও কথা তখন বলত না। সে তো জানে না যে আমি এতে খুশিই হয়েছিলুম। আমি কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু ওকে আর একটু কাছে টেনে নিলুম, অর্থাৎ ঠিক আছে রাগ করি নি।

ঠিক সাতটার সময় সেলিম আলি এল। প্রথমে দেখা করল লেখরাজের সঙ্গে, তাকে জিজ্ঞাসা করল, তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ চন্দ্রার লাভারের খোঁজ পাওয়া গেছে কিনা।

লেখরাজ বলল, এ তো ওপেন কেস, আমরা এখানেই কেস ক্লোজ করছি, মিছেমিছি থার্ড ম্যান খুঁজে লাভ কি? বডি মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছি, আমরা এখন চলে যাচ্ছি।

তাই বুঝি, ঠিক আছে আমি একটু পরে হেডকোয়ার্টারে গিয়ে আমার রিপোর্ট দিচ্ছি। কেউ ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে ঠকাবার চেষ্টা করেছিল, কেন করেছিল এবং কি চক্রান্ত করেছিল সেটা আমাদের খুঁজে বার করা দরকার। ভবিষ্যতে আমাদের সাবধান হতে হবে তো?

বাড়িতে একজন মাত্র গার্ড অর্থাৎ সেই আজমকেই রেখে পুলিস সদলে চলে গেল।

আমাদের সামনেই একটা চেয়ারে বসে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে সেলিম আলি বলল, তারপর মোতিরাম বল তোমার কি রিপোর্ট?

আমি তো কাল সন্ধ্যার পর থেকে বাগানে লুকিয়ে বাড়ির ওপর নজর রাখছি কিন্তু রাত্রে হিমতভাই কোন দিক দিয়ে বাড়ি ঢুকল? রাত্রি আটটার সময় আজম ভাই বাড়ি ঢোকবার মেন কোলাপসিবল গেটে তালা

লাগিয়ে দিয়েছে। পিছনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, তারপর আমি অনেক সুইসাইড কেস দেখেছি কিন্তু এত কম রক্ত কোথাও দেখিনি। ডাক্তারও কোনো কারণ বলতে পারল না। তারপর কোথাও এমন কি রিভলভারেও ফিঙ্গার প্রিন্ট নেই, যে লোক আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সে টাইপ করে চিঠি লেখে? আর তার চিঠি লেখবার দরকারটাই বা কি? আর টাইপ করলই যদি তাহলে চিঠির কাগজে বা টাইপ রাইটারে কোথাও হিমতভাইয়ের ফিঙ্গার প্রিন্ট নেই কেন? গ্লাভস পরেছিল? সে গ্লাভস কোথায়?

ওয়েল ডান মোতিরাম, এজন্যই তো তোমার ওপর এত বেশি নির্ভর করি। পুলিস বিশ্বাস করছে না, নিশ্চয় একজন তৃতীয় ব্যক্তি আছে। মিঃ চৌধুরী তুমি কাউকে জান?

না জানি না, মিসেস শা তো রেস্তরাঁ বা ক্লাবে যেতেন, অনেক পুরুষের সঙ্গে মিশতেন। তারমধ্যে কে তাঁর লাভার ছিল আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

কেন মিঃ চৌধুরী তুমিও তো চন্দ্রার লাভার হতে পার? অসুবিধা কোথায়?

কি যে বলেন মিঃ আলি, এসব বড়লোকের বড় কাণ্ড, আমার সঙ্গে মিসেস শা ভাল করে কথাই বলতেন না, আমাকে ভাবতেন চাকর···।

আমি আমতা আমতা করতে লাগলুম কিন্তু কথা শেষ করতে পারলুম না। তখন আমার কপাল ঘেমে উঠেছে, রুমাল বার করে মুখ মুছছি। আমার মনে হল আমি ধরা পড়ে গেছি।

ঠিক আছে মিঃ চৌধুরী ঘাবড়াবেন না। আমি এখন পুলিস হেড-কোয়ার্টারে যাচ্ছি, কিছু পয়েন্ট ক্লিয়ার করবার জন্যে আপনাকে দরকার হতে পারে।

মোতিরামকে সঙ্গে নিয়ে সেলিম আলি চলে গেল। আজম তখন বাগানে পায়চারী করছে।

ওরা চলে যেতেই সুমতি বলল আমিও চললুম অসিত, এ বাড়িতে থাকতে আমার আর ভাল লাগছে না। আমি ওর কথার কোনো জবাব দিলুম না। আমি আমার নিজের চিন্তায় মগ্ন। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সেলিম আলি ও মোতিরাম আমাকেই চক্রান্তকারীরূপে সন্দেহ করে।

মনে সাহস এনে বলি পুলিস যদি সে কথা আমাকে বলে তাহলে আমি

হিমতভাই শায়ের সেই মূল চিঠিখানা দেখিয়ে দেবো। তাতে সে স্পষ্টই লিখেছিল সে আত্মহত্যা করেছে। আমি যে হিমতভাইকে বা চন্দ্রাকে হত্যা করেছি তার কোন সাক্ষী বা প্রমাণ নেই।

ঝামেলায় দরকার কি? এক বছরের মাইনে বাবদ টাকাটা ব্যাংকে জমা আছে। সেটা তুলে নিযে কোথাও পালিয়ে যাই।

সুমতি গেছে নিজের ঘরে। আমি একটা স্যুটকেসে সেই রক্তমাখা ল্যাডকা ও পাজামা এবং আমার কয়েকখানা জামাকাপড ভরে পালাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। বাগানে আজম নেই। আজ এ বাড়িতে চা ও খাবারের আশা নেই বুঝতে পেরে সে বোধহয় কোথাও চা খেতে গেছে। তবুও আমি পিছনের গেট দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

কাছেই বাসস্টপ। বাসে চেপে বরোদা বাসস্ট্যাণ্ডে এলুম। ঘড়ি দেখলুম। ব্যাংক খুলতে এখনও দেরি আছে। ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে হবে, সেফ ডিপজিট লকার থেকে হিমতভাইয়ের আত্মহত্যার প্রথম চিঠিখানা ও তার শেষ উইল বার করতে হবে। এখনও দেরি আছে।

বাসস্ট্যাণ্ডে রেস্তরাঁয় ঢুকলুম। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। কিছু খাওয়া দরকার। খাওয়া শেষ হল। পুলিস আমার পিছু নেয় নি তো? হতে পারে। সেলিম আলির রিপোর্ট শুনে তারা কি চুপ করে বসে আছে? পুলিস চুপ করে বসে ছিল না। আজমকে ওরা ডেকে নিয়ে সাদা পোশাকে দুজন পুলিস পাঠিয়েছে। মগন ভাই এসে সুমতিকে জেরা করতে আরম্ভ করেছে। সঙ্গে আছে মোতিরাম।

আমি ভাবি দেরি করা নিরাপদ নয়। জয়ন্তীভাইকে একবার ফোন করে দেখা যাক কিছু টাকা দিতে পারে কিনা। সে সকাল আটটায় অফিস খোলে। ফোন করলুম। প্রীতি পারেখ ফোন ধরল।

প্রীতি আমার গলা চিনতে পেরে বলল, এই তুমি কি কাণ্ড করেছ? এখানে পুলিস এসেছিল। জয়ন্তীভাইকে তোমার বিষয়ে জেরা করছিল। তুমি আগে যেখানে থাকতে জয়ন্তীভাইকে পুলিস সেই বাড়িতে নিয়ে গেছে।

প্রীতির কাছে আমি কিছু ভাঙলাম না। ওর কথা শেষ হতে, পরে ফোন করব বলে লাইন ছেড়ে দিলাম। পকেটে আছে মাত্র গোটা তিরিশ টাকা। সুমতি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাকে একবার ফোন করে

দেখি। ফোন করলুম কিন্তু সুমতি লাইন ধরেনি। একজন মোটা ও কর্কশ গলায় কথা বলছে। 'কে কথা বলছে? কি চাই শুনেই আমি রিসিভার নামিয়ে রাখি। সর্বনাশ! পুলিস সব দিক ছেয়ে ফেলেছে। তাহলে তারা কি আর ব্যাংকের উপর নজর রাখছে না?

তবুও ঝুঁকি নিতে হবে। ব্যাংক খোলার সময়ও হয়ে এসেছে। বাসে করে যেতে কিছু সময়ও লাগবে। বাস স্ট্যাণ্ডে স্যুটকেসটা জমা রেখে রেল স্টেশনের সামনে বাস স্টপ থেকে বাসে উঠলাম।

ব্যাংকের দরজায় পৌঁছবার আগে পুলিসের একটা কালো গাড়ি প্রায় আমার পাশে এসে থামল। একজন জোয়ান কনস্টেবল নেমে এসে আমাকে বলল চলুন মিঃ চৌধুরী আমাদের সঙ্গে চলুন, মিঃ লেখরাজ আপনাকে হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে বলেছেন। আসুন গাড়ীতে উঠুন।

আমি গাড়ীতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে আর একজন গাড়ীতে উঠল, তার হাতে আমার স্যুটকেস।

থানায় নিয়ে গিয়ে আমাকে একটা ছোট ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হল। বেশ বুঝতে পারলুম আমার খেলা শেষ হয়েছে। কিন্তু সে সম্ভব এমন টাকা পয়সা প্রমাণ নেই। [illegible] আমাকে [illegible] ছাড়বে না, তবে কি [illegible]? [illegible] সাজাবে? ফাঁসি না হলে দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ড তো হবেই।

নিজের চিন্তায় নিজেই ডুবে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে কতক্ষণ বসেছিলুম জানি না। একজন কনস্টেবল এক কাপ চা দিয়ে গেল। বেশ গরম চা। চা খেলুম। এতক্ষণ সিগারেট খেতে ভুলে গিয়েছিলুম। একটা সিগারেট ধরালুম। সিগারেট শেষ হল তবুও ডাক পড়ে না। কে জানে কপালে কি আছে।

অবশেষে ডাক পড়ল। একটা বড় ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরে ঢুকে দেখি একটা ওভাল টেবিলের ওধারে বসে আছে পুলিস কমিশনার লেখরাজ, সেলিম আলি, মোতিরাম, মগনভাই, সুমতি এবং জয়ন্তীভাই। যেন হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ। আমি তো ঘাবড়ে গেলুম।

লেখরাজ বলল, বোসো মিঃ চৌধুরী। তারপর একটু শ্লেষের সঙ্গে বলল, শেষ উদ্ধার করতে পারলে না। তোমাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল

কারণ আমরা ডাক্তারের রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। মিঃ মোতিরামের সন্দেহ সুইসাইডের পর এত কম রক্ত কেন? আবার ডাক্তার বলছে হিমতভাই কাল রাত্রে মরে নি, মরেছে অনেকরাত্রি আগে। ভীষণ সমস্যা। সঙ্গে সঙ্গে ফোরেনসিক ডাক্তারকে তলব করা হল। তিনি আমাদের ডাক্তারের মত সমর্থন করে বললেন মিঃ শা অনেক আগে মরেছেন। আমাদের সন্দেহ ডেডবডি কোন ফ্রিজারে রাখা ছিল। সুমতিকে জেরা করে জানা গেল যে সে ঘুমের ঘোরে ডিপফ্রিজ খুলেছিল এবং একসময়ে সে যখন সুইচ বন্ধ করে [illegible] ছিল তখন তুমি [illegible] ক আজেবাজে কথা বলে আবার সুইচ চালু [illegible] ছিলে। [illegible] আমরা আরও জানতে পারলুম যে তুমি [illegible] র ফ্রিজারেটর কেম্প নর [illegible] ছিলে। ব্যাপারটা [illegible] শা সড়যন্ত্র [illegible] চাইকে [illegible] করেছ বলে আমা [illegible]।

দুর্বল কণ্ঠে আমি [illegible] না, হিম[illegible]ভাই আত্মহ[illegible] করেছে, তার মূল চিঠি আমার [illegible] আছে।

[illegible] আমরা [illegible] হিমতভাই আত্মহত্যা করলে ইন[illegible] টাকা [illegible] পাবে না [illegible] তোমাকে ভাগ দেবে না। [illegible] ভাই [illegible] করেও [illegible] তাহলে সেটা হত্যা বলে দেখাতে হবে [illegible] সুযোগের অপেক্ষায় ছিলে। [illegible] তুমি [illegible] হিমতভাই [illegible] বাদ যাত্রা করেছিলে। তলব হল [illegible] হরণকারী' হি[illegible]কে 'অপহরণ' করবে ও তাকে খুন করে [illegible] কোথাও ফেলে রাখবে। কিন্তু ইতিমধ্যে [illegible]কে তুমি [illegible] তাদের বা [illegible] প্ল্যান ভেস্তে গেল।

আমি চন্দ্রা[illegible] ইচ্ছে করে খুন করিনি, হঠাৎ হয়ে গেছে। আমি বলি।

খুন খুনই, যাইহোক তুমি স্বীকার করলে। সলিম সাহেবের ধারণা ছিল একজন থার্ড ম্যান আছে, সে যে তুমি তারও যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু তুমি ত আনাড়ি, পেশাদার খুনী নও। তাই যদি হতে তাহলে হিমত-ভাইয়ের নামে লেখা টাইপকরা চিঠিতে এবং আত্মঘাতী রিভলভারে তার হাতের প্রিন্ট অবশ্যই থাকত। তুমি আরও একটা ভুল করেছ। যে সব পোশাক পরে 'হিমতভাই' আমেদাবাদ যাত্রা করেছিল সেইসব পোশাক

হিমতভাইয়ের দেহে ছিল না। সব ব্যাপারটা তুমি ঠিকমতো চালাতে পার নি, খুবই কাঁচা কাজ করেছ। তোমাকে আমরা হিমতভাই শা ও তাঁর পত্নী চন্দ্রা শাকে হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করলুম। তোমার কোনো উকিল থাকলে জয়ন্তীভাই মারফত খবর দিতে পার এবং জামিনের আবেদনও করতে পার। তবে আমরা তোমার জামিনের আবেদনে বাধা দেবো। সেবা সিং একে ফাটকে নিয়ে যাও।

—